ইসলাম সে তো পরশ মাণিক

মনওয়ার হোসেন

ইসলাম সে তো পরশ মানিক

মনওয়ার হোসেন

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা-র পক্ষে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ই, ফা, প্রকাশনা ঃ ১৩১
ইসলাম সে তো পরশ মানিক
মনওয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর, ১৯৭৯
অগ্রহায়ণ ১৩৮৬
মহররম ১৪০০

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
খুলনার পক্ষে
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা—২

প্রচ্ছদ ঃ
মামুন কায়সার

মুদ্রণে ঃ
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম
ঢাকা

মূল্য ঃ ৮·০০

ISLAM SE TO PARASH MANIK : Islam—a Philosopher's Stone, written by Monwar Hossain and published by Islamic Foundation, Bangladesh, Dacca for the Islamic Cultural Centre, Khulna to celebrate the Commencement of 1400 Al-Hijra

Price : Tk. 8·00

ভূমিকা

ইসলাম মানে মুক্তির পয়গাম। ইসলাম মানে মানবতার সনদ। ইসলাম মানে শান্তির শ্লোগান—সাম্যের শপথ। যেখানে আশরাফ-আতরাফ এক কাতার। বাদশাহ-ফকির এক জামাত। সুখে-দুখে সব সময় মানুষে মানুষে যেখানে গড়ে তোলে মহামিলনের আরাফাত।

যুগে যুগে ইসলামের সেই সৌন্দর্য-সুষমামন্ডিত পতাকা উড়েছে সবখানে। সাম্য-মৈত্রী-প্রীতির মহান আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ্‌পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেখানে বিভেদ নাই। বৈষম্য নাই। সেখানে সবাই এক সমান। সেখানে সবার সমান অধিকার। সব দেশ সব মহাদেশের মানুষ একান্ত আপনজন। একান্তভাবে আপনার।

সেই সত্য সামনে রেখেই ইসলাম সার্বজনীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। তোমার ধর্ম তোমার জন্যে, আমার ধর্ম আমার জন্যে। কিন্তু তুমি আর আমি এক আল্লাহর বান্দা। এক আল্লাহ ছাড়া আমরা কারো গোলাম নই। আল্লাহর আদর্শেই আমরা মানবতার রজ্জু আঁকড়িয়ে আছি। আমাদের আদর্শ মানবতার মূল্যায়ন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। পবিত্র ইসলামের সৌন্দর্য-সুষমার সার্থকতা সেখানেই। পৃথিবীর শুরু থেকে ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় সোনার আখরে তা জ্বল জ্বল করছে। যে আলোর দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা ইসলামের বিজয় গর্বে মুখর হই। ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। ইসলাম এতো সুন্দর। এতো অনুপম। যার তুলনা নাই।

আর তাই ইসলামের নিশান বরদার পীর-পয়গম্বর, নবাব বাদশাহ দ্বীন-ইসলামকে পুরোপুরি আঁকড়িয়ে ধরেছেন। দ্বীন-ইসলামের সবক

গ্রহণ করেছেন প্রতিটি পদক্ষেপে। তাঁদের আচার-আচরণে চরিত্রে-চিন্তায় সবকিছুতেই ইসলামের শিক্ষা আর দীক্ষার যথার্থ প্রতিফলন। এজন্যে অনেক সময় তাঁদের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। জুলুম-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে।

তবু তাঁরা হাল ছাড়েননি। হাসিমুখে সবুর করেছেন। নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষার অপূর্ব নজীর স্থাপন করেছেন।

ইসলামের অনুসারী হিসেবে তাঁরা কাজে ও কথায় নিজেদের সততার প্রমাণ দিয়েছেন। বিজাতি-বিধর্মীকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছেন। আপনজন বলে পরম সমাদরে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। মুহূর্তে সবার মন থেকে মুছে ফেলেছেন সব ঘৃণা আর ভয়। সন্দেহ আর সংশয়। সবার জীবন জুড়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে সাম্যের সৌন্দর্য। প্রাণে প্রাণে উদ্দীপ্ত হয়েছে সম অধিকারের সংগীত। অতি বড়ো শত্রুও তাই পরম মিত্রে পরিণত হলো। দুশমন হলো দোস্ত। ইসলাম যে পরশ মানিক তা প্রমাণিত হলো যুগে যুগে বারবার। যার পরশে গোঁড়ামীর বাঁধ ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেলো। সংস্কার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রণিয়ে উঠলো ইসলামের বিজয়-বারতা। আজো তা অম্লান। অনির্বাণ। কখনো কোনদিন তা ম্লান হবার নয়।

মনওয়ার হোসেন

৪৫ দিলু রোড
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

ইসলাম কী ?

'ইসলাম সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি,
পরশে তাহার সোনা হল যাঁরা তাঁদেরেই মোরা বুঝি।'

প্রকৃত অর্থে ইসলামের গূঢ় মর্মার্থ উপলব্ধি করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামের অনুসারীদের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে ইসলাম বোধগম্য হয়ে উঠে।

রসূলুল্লাহর (সঃ) অনুপম চরিত্র-মাহাত্ম্যের মধ্য দিয়ে ইসলামের অতুলনীয় রূপ অপরূপভাবে বিধৃত হতে দেখি। সততা, সরলতা, স্নেহ-মায়া-মমতা, দয়া ও ক্ষমার মধ্য দিয়েই তাঁর সুমহান চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠেছে—দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে জগতের কাছে। পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য অনুসারীদের চরিত্রের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে—বিধৃত হয়েছে মহৎ গুণাবলী। তাই তাঁরা সম্রাট হয়েও হয়েছেন মানুষের সেবক, জালিমের কাছে হয়েছেন মহা আতংক। অন্যায়ের কাছে হয়েছেন কঠোর বিচারক, ক্ষমায় হয়েছেন মহীয়ান।

ইসলামের পরশমণির পরশেই শুধু তা সম্ভব হয়েছে।

লেখক কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে সবকিছুই অন্তরঙ্গভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম

সূচী

বাদশা নবীর আদর্শ	১
গাজী সালাহউদ্দিনের আত্মত্যাগ	৮
ইসলামের নিশান বরদার হযরত শাহজালাল	১৪
মুসলিম জাহানের গৌরব বাদশাহ হুমায়ুন	২৩
বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজীর মহত্ত্ব ও মহানুভবতা	৩০
মানবতার মহান প্রতীক বাদশাহ নাসিরুদ্দিন	৩৯
সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযান	৪৭
মহান উদার বাদশাহ আলমগীর	৫৫
সকল কালের স্মরণীয় মহাপুরুষ খান জাহান আলী খান	৫৮

আমার আম্মাকে

ইসলাম সে তো পরশ মানিক

বাদশাহ্-নবীর আদর্শ

[আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারের যুগ। অজ্ঞতার আমল। আরবের বুক জুড়ে সে-সময় অজ্ঞানতার অভিশাপ। জ্ঞানের মশাল হাতে তখন জন্ম নিলেন বাদশাহ্-নবী। জ্বালিয়ে দিলেন আলোর দ্যুতি। সে আলোয় উজ্জ্বল হলো দশদিক। জাগরণের জোয়ার বয়ে গেলো দেশ-বিদেশে।

নূর-নবীজির মুখে সোচ্চার হয়ে উঠলো পাক-কালামের বাণী। আল্-আমিন শোনালেন আল্লাহ্র কালাম। শোনালেন আল্লাহ্র পয়গাম। দ্বীন-ইসলামে অজ্ঞ-অবোধ মানুষকে দীক্ষা দিলেন। সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি আর শান্তির ফরমান নিয়ে ইসলামের হেলালী নিশান উড়লো। সব সংশয়, সংস্কার আর জড়তা-জটিলতার অবসান ঘটিয়ে, কায়েম হলো ইসলাম।

অবশ্য এই অসাধ্য সাধনে আল্লাহ্র রসূলকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক সময় বাধা-বিপত্তির মুখো-মুখি হতে হয়েছে তাঁকে। এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। তবু নিজের জীবনের প্রতিটি পরম পবিত্রতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি সত্যদ্রষ্টা আল্-আমীন। দ্বীন-দুনিয়ার আখেরী পয়গম্বর। মানব-জাতির শেষ ও শ্রেষ্ঠ শিরোপা। সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

অবশেষে অতি বড়ো বিধর্মী-বেঈমানও বশ হয়েছে। কাফের কোরায়েশরা দলে-দলে ঈমান এনেছে। পথভ্রষ্ট পথিক দু'দন্ড দাঁড়িয়েছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। যেখানে অজ্ঞানতার অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। কেবল আলো আর আলো, আলোময় আরব আজম। আলোময় দুনিয়া-জাহান।

আজ শুধু সগর্বে স্মরণ করতে হয় নূর-নবীজির সেই আলোর আদর্শ। যে-আলো দিয়ে তিনি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন সবখানে। অন্ধকার থেকে হাত ধরে নিয়ে এসেছেন আলোয়। ভ্রান্ত-বিপথ থেকে এনেছেন সঠিক সরল পথে।

নূর নবীজির জীবনের সেই মহত্তম আদর্শের এখানে আংশিক আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র। বাদশাহ্-নবীর জীবনে অসংখ্য কীর্তি-কাহিনীর মহাসমুদ্রে আলোচ্য নিবন্ধটি একটি বুদ্‌বুদ বিশেষ। ভয় দেখিয়ে নয়, আপন আদর্শেই তিনি জয় করে নিয়েছিলেন দুর্দম দুশমনকে। কাফের কোরায়েশ কিংবা ইল্লত ইহুদী কেউ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেনি। তারা সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়েছে বিশ্ব-নবীর কাজে ও কথায়। সর্বোপরি তাদের সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছে সমগ্র দুনিয়া-জাহান। তামাম দুনিয়া জাহানে মুখর হয়ে উঠেছে ইসলামের সোচ্চার কন্ঠ—লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্।

০ ০ ০

একজন ইহুদি এসেছে। আর একজন কোরায়েশ।

আল-আমিন তাদের সসম্মানে আপ্যায়ন করলেন। পরম সমাদরে পেতে দিলেন পাগড়ি। নিজের হাতে সাফ করে

দিলেন সামনের জায়গাটা। আগন্তুকরা বসলো। পরে তিনি নিজে এসে জায়নামাজে বসলেন।

সমবেত সাহাবারা অবাক। দ্বীন-দুনিয়ার নবীর কান্ড দেখে চোখ কপালে উঠেছে তাদের। রসুলে করিম একি করছেন! তার চেয়েও বড়ো কথা, দুশমনরা সাহস পেলো কি করে? এই কিছুদিন আগে বদরের যুদ্ধে এরা কতো রকমে নাজেহাল করেছে প্রিয়তম পয়গম্বরকে। বদরের ঐতিহাসিক মহাসমরে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। মাত্র তিনশত তেরো জন মুজাহিদ আর একটি অশ্ব সম্বল ছিলো তাঁর। অপর পক্ষে দুশমনদের সংখ্যা দশ গুণ, বিশ গুণ. ত্রিশ গুণ। দশ হাজারের বেশী বিরাট বাহিনী।

সাহাবারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন সব। বদর প্রান্তরের অধিকাংশ স্থান ঘিরে ফেলেছে শত্রু সেনারা। কূপ আর নহর পর্যন্ত তাদের দখলে। একফোঁটা পানি পাওয়া যায়নি। এক ফোঁটা পানির জন্যে প্রিয় পয়গম্বর ছটফট করেছেন। কাফের কোরায়েশরা তা শোনেনি। তারা শ্লেষের সংগে বলেছিলো, বিনা যুদ্ধে পানি দেবে না।

মহাবীর হামজা বলেছিলেন—আল-আমিন, আপনি হুকুম করুন। দুশমনদের কতল করি। লাশ গড়িয়ে দেই।

রসুলে করিম জবাব দিয়েছিলেন—সবুর করো। সবুরে মেওয়া ফলে। ওরা যা করে করুক। আল্লাহ্ পাক ওদের হেদায়েত করুন।

হেদায়েত তারা হয়নি। মহাবীর হামজা তা দেখেছেন। সাহাবারা দেখেছেন। মুজাহিদ বাহিনীর সকলে দেখেছে। কাফের কোরায়েশদের কুকীর্তি কে না জানে?

এই দু'জন দুশমনই ছিলো সে দলে। দিনের আলোর মত তা স্পষ্ট। দুশমনরা তা অস্বীকার করতে পারবে না। আজ কোন্ অধিকারে ওরা এসেছে? কিসের জোরে ওরা রসূলে করিমের মুখোমুখি হয়ে বসেছে? আর আল্লাহর রসূল সে সব ভুলে গিয়ে ওদের এতো যত্ন-আত্তি করলেন! বিচিত্র ব্যাপার বটে।

ততোক্ষণে নূর-নবীজি আলাপে মশগুল হয়ে পড়েছেন। সহাস্যে জানতে চাচ্ছেন সবার কুশল সংবাদ। কাফের কোরায়েশদের খবর নিচ্ছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পথে আসতে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন।

এরপর নূর-নবীজি তাদের সামনে তুলে ধরলেন কিছু খোরমা আর খেজুর। কিছু খাবার আর পানীয়। পরম বিনয়ের সাথে আরজ জানালেন তা গ্রহণ করতে। এতো দূর পথ তকলিফ করে আসার জন্যে দুঃখ করলেন।

তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে গেলো। ইহুদি তবু ওঠে না, কোরায়েশ সরদারেরও ওঠার নাম নেই।

ওদিকে জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। সাহাবারা যথাসম্ভব তাড়া দিলেন। তাড়াতাড়ি যেনো আলাপ সেরে ফেলেন।

নূর-নবীজি তেমনি হাসিমুখে জানালেন—আপনারা আর একটু বসুন। আর একটু তকলিফ করতে হবে আপনাদের। আমি নামাজ আদায় করে আসছি।

এবার দুশমন দু'জন জবাব দিলো—না, আজ আসি। আজ অনেক বেলা হয়েছে। আবার আসবো। আবার দেখা করবো।

আল-আমিন বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—ইনশাআল্লাহ্, দেখা হবে। আল্লাহপাক আপনাদের সহি-সালামতে রাখুন।

নামাজ শেষে সাহাবারা ঘিরে ধরেছেন নূরের রসূলকে তাদের চোখে-মুখে সেই একই প্রশ্ন। প্রিয়তম পয়গম্বর কি দুশমনদের চিনতে পারেননি? তারা কতো না তকলিফ দিয়েছে। কতো বেয়াদবী করেছে। আর তাদের প্রতি তিনি এতোটা সদ্ব্যবহার করলেন!

আল-আমিন জবাবে জানালেন, তিনি জবান দিয়েছেন সেদিন। সেই বদরের যুদ্ধক্ষেত্রেই ওরা তাঁকে ছেঁকে ধরেছিলো। তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলো।

সমবেত সাহাবারা উৎসুক হলেন। কি সে ওয়াদা। কিসের ওয়াদা।

দুশমনদের সাথে ওয়াদা করার কারণ কি?

নূর-নবীজি ধীরে ধীরে বললেন—তোমরা অধৈর্য হয়ো না। ধৈর্য ধরো। আমি যা বলেছি তা আমি জানি। আর জানেন আলেমুল গায়েব—আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তোমরা যা জানো না, তা নিয়ে বিরক্তি বোধ করো না। তোমরা যদি তা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠো তা হলে আল্লাহপাক নারাজ হবেন। তাই সে কথা আমি গোপন রেখেছি। রোজ্ হাশর তক গোপনই রাখবো। কখনো তা প্রকাশ করবো না।

হযরত ওমর সাহসের সংগে বলেন—কিন্তু হুজুর—আমাদের চেয়ে কি ওই দুশমনরা আপনার অধিকতর প্রিয়? আপনি তাদের বেশী পেয়ার করেন?

আল-আমিন প্রত্যুত্তরে জানান—সে বিচারের দিন আজ নয়। আজ শুধু আমাদের বুঝাপড়ার দিন। আমরা যেনো বুঝতে পারি, দুশমনদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হারাম। দুশমনদের কটূক্তি করা গোনাহর কাজ। আল্লাহ্‌র আরশ

তাতে কেঁপে ওঠে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাতে বিমুখ হন। সে গোস্তাখী-গোনাহ্ তিনি মাফ করবেন না।

কথা বলতে বলতে নূর-নবীজি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পাশে পাশে চলেছেন হযরত ওমর। সাহাবারা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন।

সহসা সে দু'জনই আবার এসে সামনে হাজির। তারা সখেদে জানালো—আর একটু বিরক্ত করবে। তিনি যেনো সময় দেন।

নূর-নবীজি তৎক্ষণাৎ তফাতে সরে গেলেন। ওরা দু'জনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

আবার একটানা অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা। দেখতে দেখতে আছরের আজানের সময় হয়ে গেছে। সাহাবারা বিরক্তি বোধ করছেন।

নূর-নবীজি তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন মসজিদের পানে। আগন্তুকদ্বয়ও সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে। সাহাবারা যাচ্ছেন পিছু পিছু।

নূর-নবীজি আছরের নামাজ শেষে অনুরোধ করেন—আজ আপনারা তকলিফ করুন। আজকের রাতটা থেকে যান। আমি ওয়াদা করছি, ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। প্রয়োজন হলে আমি সারারাত আপনাদের পাহারা দেবো।

আগন্তুকদ্বয় উচ্চকিত হয়ে উঠলো—তা জানি, আপনি মিথ্যা কথা বলেন না। আপনি আল-আমিন।

সহাস্যে নূর-নবীজি বলেন—তা হলে আসুন আপনাদের জন্যে সামান্য কিছু আয়োজন করি।

আগন্তুক দুজনে জানালো—আজ নয়। আর একদিন আসবো। আল-আমিনের সামনে আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

দিইনি। কিন্তু আমাদের সেই এক কথা। আপনি আমাদের নসিহত করবেন। আমরা সব ভুলে আপনার কাছে হেদায়েত চাই। জোর নসিব বলে আপনাকে পেয়েছি।

নূর-নবীজি তখন দু'জনের কাঁধে দু'হাত বিছিয়ে দিয়েছেন। মুখে তাঁর পাক কালামের পূত বাণী।

সমবেত সাহাবারা সমস্বরে শোরগোল তুলেছেন—আলহামদু লিল্লাহ্। আলহামদু লিল্লাহ্।

গাজী সালাহ উদ্দিনের অপূর্ব আত্মত্যাগ

[জেরুজালেম জয়ের বীর সিপাহসালার গাজী সালাহ উদ্দিন। মুজাহিদ বাহিনীর মহা-অধিনায়ক। ইসলামের ইতিহাস যাকে আলীর জুলফিকার হিসেবে অভিহিত করেছে। বিশ্বের ইতিহাসে যাঁর বীরত্বের তুলনা একমাত্র তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই বহু যুদ্ধে বিজয়ী বীররূপে তিনি সম্মানসূচক গাজী উপাধিতে ভূষিত হন।

মুসলিম জাহানের চরম দুর্দিনে গাজী সালাহ উদ্দিন হাতে নিয়েছিলেন হাতিয়ার। মুসলিম জাহানের সেই সংকট সন্ধিক্ষণে তাঁর অমিত তেজ অবিস্মরণীয়। তাঁর অসীম সাহসিকতার ফলে ইসলামের গৌরব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। মুসলমানদেরকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে সেদিন তিনি রক্ষা করেছেন। বরং বলা যায়, ইসলাম সেদিন আবার নতুনভাবে কায়েম হয়েছে সারা দুনিয়ায়।

বিপুল বিক্রমে বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে বারবার যুদ্ধ জয় করা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অথচ তাঁর পক্ষে ছিলো মুষ্টিমেয় মুজাহিদ। আক্রমণকারীদের তুলনায় তাঁর সমরাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ছিলো নিতান্ত অপ্রতুল। ইতিহাস তাই এই বিজয়ী মহাবীরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। গাজী সালাহ উদ্দিন চিরকালের স্মরণীয় বীরশ্রেষ্ঠ দালিয়ার।

অপর দিকে মহাবীর গাজী সালাহ উদ্দিন সর্ব যুগের মহান মানুষ হিসেবে স্বীকৃত। দুর্নিবার বীরত্বের সংগে তাঁর চরিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে অতুলনীয় মহত্ত্বের ঔদার্য। অতি বড়ো বৈরীকেও তিনি সেবা শুশ্রূষায় নিরোগ করে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি। সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনীর অধিনায়ক রিচার্ডকে তিনি নিজ হাতে পরিচর্যা করেছেন। সেদিনের মুসলিম জাহানের পরম শত্রু খ্রীষ্টান নরপতি রিচার্ডের গুরুতর অসুস্থতার কথা শুনেই তিনি ছুটে গেছেন। স্বপক্ষের অবধারিত বিজয় জেনেও যুদ্ধ স্থগিত রেখেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন পাক কালামের পূতবাণী আর নূর-নবীজির নির্দেশ। ইসলামের শিক্ষাও সৌন্দর্য দেদীপ্য হয়েছিলো তাঁর আচারে-আচরণে, চিন্তায়-চরিত্রে। মহাবীর মুজাহিদ হয়েও তাই তিনি মোমিন-মুসলিম। পাক্কা ঈমানদার মুসলমান।

অজেয় মহাবীর গাজী সালাহ উদ্দিন মানবতার মাধুর্য দিয়ে জয় করেছেন শত্রু-মিত্র সকলকে। ইতিহাসের চেয়েও বড়ো সত্য তাঁর মানবতাময় মুজাহিদ জীবন যার সবটুকু ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ইসলামের সৌন্দর্যে আলোকিত।

কথিত নিবন্ধে মহাবীর মুজাহিদ গাজী সালাহ উদ্দিন সম্পর্কে ছিটেফোঁটা আলোচনা করা হয়েছে—তাঁর অসাধারণ কীর্তির তুলনায় যা নিতান্ত তুচ্ছ।]

o o o

সারা ইউরোপ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে হানাদার আসছে বারবার। তাদের প্রতাপে মুসলিম জাহান টালমাটাল। মক্কা মদিনা, আরবের মুসলমানরা বিপর্যস্ত।

মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার গাজী সালাহ উদ্দিন তবু অকুতোভয়। সেই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। উপর্যুপরি সতেরোবার সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী পরাভূত হয়েছে।

তারপরও ইউরোপের রাজন্যবর্গ হাজার হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আসছে। তাদের শৌর্য-বীর্য-শক্তি অসীম। আধুনিক সমরাস্ত্রে তারা সুসজ্জিত।

ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর অধিপতি গাজী সালাহউদ্দিন অবশেষে আহ্বান জানালেন—অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করো। লাখে লাখে লোক খুন করে কি লাভ।

অবশ্য তিনি জানালেন যদি সম্মানজনক সন্ধি না হয়, যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। মোকাবিলা করবেন দুশমনদের। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁর ওয়াদা এই পবিত্র ওয়াতান বিধর্মীর নাংগা তলোয়ারে লালে লাল হতে দেবেন না। রসুলে করিমের পাক কদমের পরশ পেয়ে এ মাটি ধন্য। এখানে বিধর্মীদের পায়ের দাপট পড়তে পারে তা অসম্ভব। এক বিন্দু রক্ত থাকতে তা হবার নয়।

সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি শুনে শুধু হেসেছেন। সিপাহসালার সালাহ উদ্দিনের কথাকে তিনি দম্ভ বলে ভেবেছেন। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা—যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলবে। আমরা কাপুরুষের মতো হার মানবো না। ইসলামের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।

মহাবীর সালাহ উদ্দিন মরিয়া হয়ে উঠেছেন, মুষ্টিমেয় মুজাহিদ দল নিয়ে বিরাট বাহিনীর সাথে লড়ছেন। ক্রমাগত পিছু হটছে দুশমন দুরাচার হানাদার। আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত।

হঠাৎ খবর এলো খ্রীষ্টান নরপতি রিচার্ড গুরুতর অসুস্থ। মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

গাজী সালাহ উদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না। হেকিমের ছদ্মবেশে শত্রু শিবিরে হাজির হলেন। দিনের পর দিন খেদমত আর এলাজ করলেন। গোপনে স্বীয় সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ স্থগিত রাখতে। নিজের দেশে নিজের মাটিতে মুমূর্ষু শত্রুকে প্রাণে বধ করবেন না। পবিত্র ইসলামের বিধান তা নয়। ইসলাম বলে দুশমন যদি নিজের দেশে আসে, তাকে আপ্যায়ন করো। আপন আবাসে দুশমনের দেখা পেলে তাকে আপন করে নাও। আর দুশমন যদি বিপদাপন্ন হয় তা হলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা মোমিনের জন্যে মুস্তাহাব।

পূত-পবিত্র ইসলামের এই মহান আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। পাক-কালামের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র পেয়ারা বান্দা নূর-নবীজির প্রিয় উম্মত।

খ্রীষ্টান নরপতি রিচার্ড সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চান। আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। হাসিমুখে অভিবাদন জানান। বলেন—হে বুজর্গ দরবেশ! আপনাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি? সমস্ত প্রশংসা আপনার প্রাপ্য। বলুন কি পুরস্কার পেলে আপনি খুশী হন?

মহীমতি সালাহ্‌ উদ্দিন বিদায় বেলায় জানালেন তিনি কিছুই চান না। সম্রাট সুস্থ হয়েছেন এতেই তিনি সুখী। এর চেয়ে বড়ো পাওনা তাঁর কাম্য নয়। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরেই নরপতি রিচার্ড জানতে পারলেন সব। এইমাত্র যিনি চলে গেলেন তিনি অন্য কেউ নন। স্বয়ং সিপাহসালার সালাহ উদ্দিন। যাঁর সেবা শুশ্রূষায় নিশ্চিত নব জীবন পেয়েছেন। বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাঁচার আশা ছিলো না। সেনাবাহিনী ধরেই নিয়েছিলো, তিনি মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যু ছিলো একরকম অবধারিত।

সব জেনে-শুনেই গাজী সালাহ উদ্দিন তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। অক্লান্ত নিষ্ঠার সংগে তাঁর চিকিৎসা ও পরিচর্যা করেছেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে হেকিমের ছদ্মবেশ ধরেছেন। এমন ত্যাগের মহিমা কোথাও নেই।

শেষে সম্রাট রিচার্ড ছুটে আসেন সিপাহসালার গাজী সালাহ উদ্দিন সমীপে। সহাস্যে বলেন—আমি যার প্রাণ সংহার করতে চেয়েছি সে সশরীরে এসে ধরা দিয়েছে। তখন কিছুই টের পাইনি। এখন হাতে পেয়ে আর ছাড়ছি না।

অতঃপর সম্রাট রিচার্ডের মুখে প্রশংসার ফুলঝুরি ফুটলো। খ্রীষ্টান নরপতি প্রশংসার পুলকে ফেটে পড়লেন।

গাজী সালাহ উদ্দিন হাসতে-হাসতে জবাব দেন—আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার হাজার শোকর। আল্লাহ্‌র মেহের-বানীতে আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

মুখোমুখি সেদিন দুই সৈনিক পুরুষ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দু'জনের হৃদয় জয়ের উল্লাসে ভরপুর। কাল যে ছিলো পরম দুশমন, আজ সে সত্যিকারের দোস্ত।

সম্রাট রিচার্ড দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। গাজী সালাহ উদ্দিন তাঁর সামনে তুলে ধরেছেন ইসলামের সৌন্দর্য। রিচার্ড মনে-প্রাণে মুগ্ধ। আর যুদ্ধ নয়, তিনি সৌহার্দ স্থাপন করবেন। মুসলিম জাহান তাঁকে মহান প্রেরণা

দিয়েছে। ত্যাগের দীক্ষা দিয়েছে দ্বীন-ইসলাম। এই জয়ের গৌরব তিনি সংগে করে নিয়ে যাবেন সাত সাগর তের নদীর পারে। সেখানে স্মরণ করবেন পবিত্র ইসলামের পূতবাণী। গাজী সালাহ উদ্দিন তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। ইসলামে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ভাই-ভাই। ইসলাম মানে শান্তির শপথ। ইসলাম মানে মানুষের খেদমত। ইসলাম মানে মানবতার সনদ। সেই সর্বগুণে গুণান্বিত ইসলামের মহান আদর্শই তাঁকে জীবন দিয়েছে। ইসলামের অপার সৌন্দর্যেই তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন। সিপাই-সালার সালাহ উদ্দিনের সাথে দেখা না হলে তিনি কোনো কিছুই অবহিত হতেন না। এতোদিনে তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

ইসলামের নিশান বরদার

হযরত শাহজালাল

[ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত শাহজালাল এ দেশে আসেন। সুরমা নদী পার হয়ে সিলেটে আস্তানা গাড়েন।

এই মুসলমান দরবেশের আগমন হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো। দেশজোড়া হিন্দু-জনগণ দরবেশকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছিলো। তাদের আপাতঃ দৃষ্টিতে দরবেশ ছিলেন দুশমন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হলো, দরবেশের মতো মহান মানুষ আর নাই। তিনি সব মানুষের মংগলকামী মিত্র। সবার বিশ্বস্ত বন্ধু আর অভিভাবক।

দলে-দলে লোকজন এসেছে তখন দরবেশের দরবারে। মনে-প্রাণে মুগ্ধ হয়েছে দরবেশের ব্যবহারে। কিংবদন্তীর মতো সে কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। এমনকি পলাতক রাজা গৌরগোবিন্দ সদলবলে হাজির হয়েছে দরবেশের কাছে। ছদ্মবেশ ধরে তারা দরবেশকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। দয়ার সাগর। মায়া-মমতার মহাসমুদ্র। পরে দরবেশের পদপ্রান্তে বসে সব দোয়া নিয়েছে। দীক্ষা গ্রহণ করেছে।

পুণ্য শ্লোক হযরত শাহজালালের এক হাতে ছিলো তসবিহ, আর এক হাতে তলোয়ার। রাজা গৌরগোবিন্দের অত্যাচারে যখন দেশবাসী অতিষ্ঠ, তখন তিনি কয়েকজন মুরিদ নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। সমস্ত অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপনে প্রয়াস পান। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা পুংখানু-পুংখরূপে প্রমাণ করেন।

হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয় ইতিহাসের শ্লাঘার বিষয়। মহান দরবেশ সেদিন স্বয়ং ছিলেন সিপাহসালার। তাঁর সাথী-সংগীরাই ছিলেন তাঁর পক্ষে বীর সেনানী। রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে সে অভিযান সাফল্য আর সার্থকতার সাক্ষ্য দেয়। অলৌকিকভাবে সে সময় হযরত শাহজালালের আবির্ভাব না হলে দেশব্যাপী দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ দূর হতো না। একটানা অরাজকতার অবসান হওয়া অসম্ভব ছিলো।

দরবেশ-আউলিয়া হযরত শাহজালাল এসে শিক্ষা দিলেন মানুষ মানুষের ভাই। মানুষে মানুষে হিংসা হানাহানি চলতে পারে না। মানুষ যদি মানুষকে ভালো না বাসে তা হলে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে। আল্লাহ্ পাক তাতে নারাজ হন। মানুষের জন্যে তখন নেমে আসে আল্লাহ্‌র লানত-গজব-অভিশাপ।

হযরত শাহজালালের সারাজীবনের মূলমন্ত্র ছিলো তাই মানুষকে ভালোবাসা। মানুষের সেবা করা। আল্লাহ্ পাকের এবাদত বন্দেগীর মূলে যে মানবতার কল্যাণকামী আদর্শ নিহিত তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন। হযরত শাহজালাল নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন ইসলামের সর্বাংগীন সুন্দর বিধি-বিধান বিশ্বের সর্বত্র

গ্রহণযোগ্য। আজ না হয় আগামী দিন বিশ্ববাসী তা পরম সমাদরে গ্রহণ করতে বাধ্য।

একমাত্র ইসলাম-ই মানুষকে দৈন্য-দীনতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলাম কায়েম করতে পারে শান্তির রাজ্য। ইসলামের বদৌলতেই দ্বীন-দুনিয়া আর আখেরাতে অশেষ শান্তি পাওয়া যায়।

ইসলামের সেই পরশ-মানিক হাতে নিয়ে এসেছিলেন হযরত শাহজালাল, যার পরশে এ-দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আলোর আভা প্রদীপ্ত হয়েছে। ইসলামের বিজয় বার্তা ঘোষণা করে দামামা বেজেছে সমগ্র দেশ দুনিয়ায়। হযরত শাহজালালের পূত-পবিত্র কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই স্মৃতি সুন্দর সত্য অনির্বাণ প্রেমিক পুরুষ হযরত শাহজালালকে আজো তাই অযুত সালাম জানায় মানুষ। সগর্বে তাঁকে স্মরণ করে ঘরে ঘরে। মহামানবের মহামেলায় তিনি চিরদিন স্মরণীয়-বরণীয়। তাঁর সম্পর্কে বাহুল্য আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কথিত নিবন্ধে কিছুটা প্রাসংগিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।]

o o o

সুরমা নদীর পারাপার বন্ধ। একূলে-ওকূলে কোথাও নৌকা নেই। মাঝি-মাল্লার পাত্তা নেই। নদী পার হওয়া সম্ভবপর নয়।

রাজা গৌরগোবিন্দ আদেশ দিয়েছেন মাঝিরা যেনো না যায়। নৌকাগুলো অথই পানিতে ডুবিয়ে দেয়। নদীর তীরে জনপ্রাণীর চিহ্ন যেন না থাকে।

রাজ-আজ্ঞা কে লংঘন করবে ? ক'দিন ধরেই এই ব্যবস্থা। এই রকম বিধান।

শুধু সুরমার পার নয়। সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চারপাশে চৌকি বসেছে। তারা দূর থেকে লক্ষ্য করছে সব।

কোন অপরিচিত জন আসার সাথে সাথে রাজাকে খবর দিতে হবে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলে রাজা যেনো সংগে সংগে জানতে পারেন।

অনেক আগে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানে স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তার উপর তো আছেই সাধু-সন্ন্যাসীরা সদলবলে। তারা দিবারাত্র তন্ত্রমন্ত্র জপ করছে। অগ্নিকুন্ডলী জ্বালিয়ে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে।

রাজ্যের যাদুকররা জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। রাজা তাদের জড়ো করেছেন। যাদুর জোরে অসাধ্য সাধন নাকি সম্ভব। রাজার হুকুম যেভাবেই হোক রাজ্য রক্ষা করা চাই। মান-সম্ভ্রম যায় যাক্।

তবু সবরকমের বিধিব্যবস্থা করেও রাজা ভয়মুক্ত হতে পারছেন না। তার সদা সংশয় এই বুঝি এসে পড়লো। এই বোধ হয় আসছে।

রাজা তাদের আসার খবর পেয়েছেন। রাজা বিশ্বস্তভাবে জেনেছেন একদল ফৌজ আসছে। একদল সুফী-সিপাই। সেইজন্যে চারদিকে চর রেখেছেন। চারদিকে চৌকি বসিয়েছেন। সতর্কতার সাথে পাহারা দিচ্ছে তারা। প্রতিটি লোকই পাহারায় নিযুক্ত। প্রতিটি লোকই প্রহরী। যে পথে আসুক তিনি টের পাবেন। তা ছাড়া কোন দিকে কোন ফাঁকে আসার উপায় নেই।

রাজার হুকুমে ক'দিন থেকে নদীতে নৌকা ভাসছে না। নদী-পথে কোন বাহন মেলে না। আর নদীর এপারে ওপারে

পাহাড়ের পর পাহাড়, যাদুকররা যাদুর জোরে বিরাট বিরাট শিলার প্রাচীর তৈরী করে রেখেছে। একটা সুঁচও হাতে ঢুকতে পারবে না। সব দিক দিয়েই প্রবেশ-পথ বন্ধ।

সুরমার তীরে দাঁড়িয়ে হযরত শাহজালালও সেই কথা ভাবছেন। কি ভাবে নদী পার হবেন। কেমন করে ওপারে যাবেন।

সাথী সংগীরা বিব্রত বোধ করছেন। অনেক দেরী হয়ে গেছে। অনেক দূর থেকে তাঁরা আসছেন, সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত। সর্বোপরি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্য পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমে। দিনের আলো থাকতে পার না হলে রাতের আঁধারে মুশকিল হবে। অচেনা অজানা জায়গায় পথ খুঁজে পাবেন না। কোন খানে আস্তানা গাড়ারও অসুবিধা হবে।

সংগের মুরিদদের মনের কথা ভেবে মুর্শিদ মুখে বললেন—বিছমিল্লাহ্। তারপর নামাজ-পাটি বিছিয়ে দিলেন দরিয়ায়। এই তাঁর কিশতী। এই তাঁর বাহন। এই জায়-নামাজ বিছিয়েই নদী পার হয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌র নামে কি না হয়। সেই ভরসাতেই হুকুম দিলেন—জলদী চলো। জলদী চলো।

সুরমা পাড়ি দিয়েই চোখে পড়লো পাহাড় আর পাহাড়ের সারি। শিলার বেষ্টনী দিয়ে সর্বত্র ঘেরা। আবার বিছ-মিল্লাহ্ বলে হুকুম করলেন—সিল্‌হট যাও। সিল্‌হট।

আল্লাহ্‌র কী অপূর্ব মহিমা! নিমেষে সিল আর শিলা সরে গেলো। উন্মুক্ত হলো প্রবেশ-পথ। বিনা বাধায় দলবলসহ সিল্‌হট বা সিলেট ঢুকে পড়লেন হযরত শাহজালাল।

দেখে শুনে রাজা গৌরগোবিন্দ ভয়ে পালিয়েছে। তার সেনা-সামন্তরা প্রাণভয়ে পলাতক রয়েছে। সাধুসন্তরা

ঊর্ধশ্বাসে দৌড় দিয়েছে। যাদুকররা নাকে খত দিয়ে ভেগে গেছে। ইহজনমে তারা এমন দৃশ্য দেখেনি। এমন অলৌকিক কান্ডের কথা কেউ শোনেনি।

ক'দিন পরেই তারা আবার দেখতে পেলো দরবেশের দোয়ার বরকতে সিলেটের মাটিতে সোনা ফলছে। সিলেটের মাঠে মাঠে সোনার ফসল। মানুষের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। ঘরে-ঘরে সুখের মুখ দেখছে সবাই। সত্যিই অভাবনীয় ব্যাপার।

যারা গা ঢাকা দিয়েছিলো তারা এবার প্রকাশ্যে এসে পড়লো। দরবেশকে দেখার জন্যে তারা তখন পাগল হয়ে পড়েছে। দরবেশের দোয়া তাদের চাই। দরবেশের কাছে মাফ চেয়ে নেবে তারা।

হযরত শাহজালাল সবে আস্তানা গেড়েছেন, মাত্র আড়াই হাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া তাঁর হুজরাখানা। সেখানেই অহরহ ধ্যানমগ্ন থাকেন তিনি। তাঁর সাথী-সংগীরা আশে-পাশের পাহাড়ে পর্বতে সাধনারত রয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁরা হযরত শাহজালালের নিকটে আসেন। মাঝে মাঝে তাঁদের দর্শন মেলে। সমগ্র সিলেট এলাকা হয়ে গেছে পবিত্র পীঠস্থান, হযরত শাহজালাল হাতে করে যে মাটি এনেছিলেন সে মাটির সাথে মিলে গেছে সিলেটের মাটি। কি আশ্চর্য মিল। আল্লাহ্‌র কি কুদরত।

হযরত সিলেটে এসে ছেড়ে দিয়েছেন শান্তির প্রতীক পায়রা। সুফী সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন জোড়ায়-জোড়ায় কবুতর। দিল্লী থেকে সেই শান্তির নিশান তিনি সংগে করে নিয়ে এসেছেন। সিলেটের আকাশে-বাতাসে তা পাখা মেলছে। হযরতের

হুজরাখানার চারপাশে পায়রাগুলো পাহারা দেয়। ডাক দিলেই হাতে এসে বসে। গায়ে-মাথায় দোল খায়। একটু আদর দিলেই গলে যায়।

লোকে দেখে তাজ্জব হয়। সত্যি সত্যিই শান্তি-কপোত। শান্তির বাণী বয়ে এনেছে বুঝি।

আর এই পায়রার যিনি প্রতিপালক তাঁর মুখে কি প্রশান্তি। কি কন্দর্প কান্তিরূপ। কি মনোমোহিনী কাঁচা সোনার বরণ চেহারা। দেখলে দু'নয়ন জুড়িয়ে যায়।

দলে দলে লোক আসছে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে দেখছে। দরবেশের কাছে আসতে কারো কোন বাঁধা নেই। দরবেশের দরজা সবার তরে খোলা।

তবু গোল বাঁধালো গৌড়গোবিন্দের কিছু অনুচর। তারা গোপনে-গোপনে রটাতে লাগলো, দরবেশ তুকতাক দিয়ে সবাইকে মুসলমান করছে। আসলে দরবেশের এই আদলটাই হলো ভেলকী। এ তল্লাট জুড়ে একটাও হিন্দু থাকবে না। সবাইকে জোর-জবরদস্তি মুসলমান হতে হবে। ইসলাম প্রচারের জন্যেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি এসেছেন দলবল নিয়ে ইসলাম প্রচার করতে। ধর্মের দোহাই দিয়ে কাজ হাসিল করবেন। বোকা মানুষকে ধোকা দেয়ার অব্যর্থ ফন্দী। ফকির বাবার ফিকির।

তলে-তলে তারা তৈরী হলো—আর একবার দেখবে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবে। দরবেশের দলবলকে দেশ-ছাড়া করতে হবে। দেখা যাক্ কি হয়।

ও-দিকে দরবেশের আশেপাশে কড়া নজর রাখলো তারা। তিনি কোন দুষ্ট কৌশল করছেন কি না তারা জানতে চায়। কোন দুরভিসন্ধি তাঁর মনে আছে কি না জানা যাবে।

শলা-পরামর্শ করে কয়েকজন যাদুকর দরবেশের সংগ নিলো। চব্বিশ ঘন্টা তারা দরবেশের সংগে থাকে। এক-দন্ড কাছ ছাড়া হয় না। দরবেশের সেবা-যত্নে সব সময় তারা তৎপর। কোথাও কোন ফাঁক বা ফাঁকি নেই। দরবেশকে কোন কিছুই বুঝতে দেয় না।

দিন যায়। মাস যায়। তারা আর ফিরে আসে না। তাদের অহেতুক বিলম্ব দেখে আর একদল এসে জুটলো। তারাও সেই সনাতন পন্থায় সেবা করে যেতে লাগলো। তারপর এলো আরো একদল। এমনিভাবে যতো দিন যায় ততোই তারা দলে-দলে আসে। শেষ পর্যন্ত কেউ আর ফেরে না।

হযরত শাহজালাল একদিন তাদের একান্তে ডাকলেন। অভয় দিয়ে বললেন—যার যা বাসনা আছে প্রকাশ করতে পারো। তোমরা এক-একজন করে একাকী এসো। একা একা যা বলার বলো, শুনবো শুধু আমি আর আলেমুল গায়েব। আর কেউ জানতে পারবে না।

সুযোগ পেয়ে সবাই তখন হযরতকে মনের কথা খুলে বলে। তারা এসেছিলো দুরভিসন্ধি নিয়ে। তারা গৌড়-গোবিন্দের গুপ্তচর।

হযরত শাহজালাল জানালেন—সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। কোথায় কবে কে কি করেছে তাও তিনি বলে দিলেন। তবু তারা যদি ফিরে যেতে চায় তিনি বাধা দেবেন না। বরং তাদের সহায়তা করবেন। তারা দরবেশের দোয়া পাবে।

কিন্তু কেউ আর ফিরে যেতে রাজী হলো না। দরবেশকে ছেড়ে তারা থাকতে পারবে না। দরবেশ তাদের দরদ দিয়ে জয় করে নিয়েছেন।

হযরত শাহজালাল তারপর সমবেত মুরিদদের ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলেন। ইসলামের সেই সৌন্দর্যের বাণী ছড়িয়ে গেলো দিকে দিকে। পবিত্র ইসলামের স্পর্শে যে অতি বড়ো শত্রুও মিত্র হয় তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। সিলেট ছাড়িয়ে সে-কণ্ঠ সোচ্চার হলো সারা বিশ্বের সবখানে।

অবশ্য হযরত শাহজালাল সিলেট ছেড়ে কোথাও গেলেন না। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে ধ্যানমগ্ন থাকলেন নিজের হাতে তৈরী স্বল্পপরিসর হুজরাখানায়। তার পাশেই তাঁর পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়। সেখানেই হযরত শাহজালালের দরগাহ। চির শান্তির রওজা মোবারক।

মুসলিম জাহানের গৌরব বাদশাহ হুমায়ুন

মোগল গর্ব বাদশাহ হুমায়ুন মুসলিম জাহানের গৌরব। মুসলমানের আখলাক তিনি বজায় রেখেছিলেন কর্মময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ইসলামের ঐতিহ্য তুলে ধরেছিলেন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। বাদশাহ হিসেবে তাই তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। খাঁটি মুসলমান হিসেবে বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী। সমকালীন ইতিহাস থেকে সর্বকালের সম্মানিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব।

বাদশাহ হুমায়ুনের চরিত্রে মহৎ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। মহৎ গুণাবলীর জন্যেই তিনি জীবদ্দশায় ভূয়সী প্রশংশা পেয়েছেন। মৃত্যুর পর হয়েছেন অমরত্বের প্রতীক। বাদশাহ হুমায়ুনকে বলা হতো জালিমের শত্রু। মজলুমের মিত্র। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অটল থাকায় অনেকে তাঁকে অভিহিত করেছেন ন্যায়বিচারক বলে। অতিবড়ো আপনজন অন্যায় করলেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। স্বজনপ্রীতি তাঁর আদপে ছিলো না। যেকোন জাতি-ধর্মের প্রতি তাঁর ছিলো সমান মহানুভবতা। যেকোন জাতি বা যেকোন ধর্মের মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। তাদের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাতে নিজের ক্ষয়-ক্ষতি হবে ভেবে ভয়ে ভীত হননি। যে কারণে বাদশাহ

হুমায়ুনের জীবন বিপন্ন হয়েছে বারবার, সে অবিচল আদর্শের মূল্য দিতে যেয়ে তাঁর সিংহাসন পর্যন্ত হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। স্বজাতি স্বধর্মের লোকের চোখে বিরাগভাজন হয়েছেন। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর চোখের শূল হয়ে পড়েছেন।

তা সত্ত্বেও বাদশাহ হুমায়ুন সব কাজেই ছিলেন সংশয়মুক্ত অটল নির্ভয়। ন্যায়ের স্বপক্ষে তাঁর সংগ্রাম ছিলো অব্যাহত। সত্য আর ন্যায়ের নিশান তিনি সমুন্নত রেখেছেন।

বাদশাহ হুমায়ুনের বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়নি। রাজপুত মারাঠা শিখ সুরী সবাই মিলে সেখানে ছিলো সমান সুখী। রাজকার্য পরিচালনায় সবার ছিলো সমান অধিকার। সর্বোপরি দুঃখের দিনে বাদশাহ ছিলেন সবার স্বজন। এমনকি স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে বিপন্ন জনের জন্যে মরণপণ করে ছুটেছেন। নিজের ভাগ্য বিড়ম্বনার তোয়াক্কা করেননি।

বাদশাহ হুমায়ুনের সেই সুমহান সুবিস্তৃত আদর্শ কর্মকান্ডের এক টুকরো কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে। সে ইতিহাস সামান্য হলেও অসামান্য সাফল্য কৃতিত্বে সুষমামন্ডিত। ইসলামের সৌন্দর্য আর সার্থকতা সেখানেই সমুজ্জ্বল।]

o o o o

চিতোরের রাণী এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। এখুনি রওনা হতে হবে। একেবারে জরুরী ডাক।

বাদশাহ হুমায়ুন পত্রখানা পড়লেন। রাণী কর্ণবতীর সেই প্রথম আর শেষ পত্র। তাঁর আকুল আরজ, পত্রপাঠ

মাত্র আসুন। দূতের আগে আপনার আসা চাই। পথ চেয়ে বসে আছি।

কর্ণবতী স্বহস্তে লিখেছেন, এই আমার রাখী পাঠালাম। আজ থেকে আমি আপনার ছোট বোন। আপনি আমার আদর্শ অগ্রজ। শীগগির এসে বোনের প্রাণ বাঁচান।

পড়তে পড়তে বাদশাহ্‌র দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। রাণী কর্ণবতীর কান্নাঝরা কন্ঠ যেনো তিনি শুনতে পাচ্ছেন। বাদশাহ্‌র কানে আসছে করুণ কান্নার কাকুতি। তিনি আর পড়তে পারছেন না!

দূত দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায়। বাদশাহ্‌র জবাব হলেই দূত দৌড়ে যাবে। রাণীর নির্দেশ দু'দন্ড যেনো দেরী না করে।

দিল্লীর দরবারে তখন সাজসাজ রব পড়ে গেছে। উজীর-নাজির পাত্র-মিত্র পারিষদ রণ-সজ্জায় সাজছে। বাদশাহ্‌ তলব করেছেন সিপাহসালারকে। তাঁর কড়া হুকুম এই অভিযানে বিলম্ব করলে চলবে না। এই মুহূর্তে সসৈন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।

শিবিরে শিবিরে বিউগল বেজে উঠলো। নকীবরা দামামা বাজিয়ে চললো। রাজ-ঘোষক যুদ্ধের বারতা ঘোষণা করলো।

বিদায় নেবার জন্যে বাদশাহ্‌ এসেছেন হারেমে। পরনে তাঁর জংগের পোশাক। শিরে শিরোপার বদলে শিরস্ত্রাণ। পিঠের পাশে কোষবদ্ধ নাংগা তলোয়ার।

বেগম চমকে উঠেছেন। এমন অবস্থায় বাদশাহ্‌কে কখনো দেখেননি। তাঁর জীবনে যুদ্ধ দেখেছেন বটে। দেখেছেন একটার পর একটা যুদ্ধ। বাদশাহ বিব্রত হয়ে

ছুটেছেন জংগের ময়দানে। সব আরাম হারাম করেছেন। কখনো বা বীর বিক্রমে শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মোগল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে অনেক শৌর্য-বীর্য আর ত্যাগ তিতিক্ষায়।

বেগম সাহেবা সবই জানেন, সব খবরই রাখেন। তাঁর চোখের সামনে ঘটছে কতো ঘটনা। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মোগল সিংহাসন এখনো কন্টকাকীর্ণ। মোগল সাম্রাজ্য এখনো নিরাপদ নয়। দরজায় দুশমনের হানা। হিংস্র হানাদারদের হামলা। দিল্লীর দরবার মুহূর্তে কাঁপছে।

একদিকে পাঠানরা আক্রমণ করছে। আর একদিকে আফগানদের হামলা। শিখ-সুরীদের আক্রোশেরও বিরাম নেই। একটা না একটা যুদ্ধ লেগেই আছে। একটানা যুদ্ধে মোগলবাহিনী বিব্রত বিপর্যস্ত।

স্বয়ং সম্রাট বহু অভিযানে অংশ নিয়েছেন। যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন নিজে। হাসিমুখে আবার বিজয়-বারতা নিয়ে ফিরে এসেছেন। আবার যুদ্ধে গিয়েছেন।

তবে সম্রাটকে সৈনিকের সাজে কখনো দেখেননি। সেনাপতির সাজ-সজ্জা কখনো সর্বাংগে ধারণ করেননি। এই প্রথম। হয়তো বা এই শেষ।

কি জানি কোন অজানা আশংকায় বেগম শিউরে ওঠেন। সহসা তাঁর দু'নয়ন বেয়ে দর দর বেগে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বাদশাহ তাড়াতাড়ি পত্রখানা তুলে দেন বেগমের হাতে। আর কোনো কথা নয়। কোন ভাষা নয়। বাদশাহ বিদায় নেন নীরবে—নিঃশব্দে।

বেগম থর থর করে কাঁপছেন। তাঁর হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে। চোখের পানিতে বুক ভাসছে। অনেক কষ্টে

নিজেকে সামলিয়ে দেখলেন রাখী ডোরে বাঁধা একখানা পত্র। লাল খুনের আবীরে রাঙা লেফাফা।

সকৌতুকে সোৎসাহে বেগম সাহেবা পড়লেন। রাজপুত রাণী নিজের বুকের রুধিতে লিখছেন সে চিঠি। রাণী কর্ণবতীর অব্যক্ত কথা যেনো তিনি পড়তে পারছেন।

একবার। দু'বার। তিনবার। বেগম সাহেবা বার বার পত্রখানা পড়লেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে বুঝি। রাণী কর্ণবতী লিখেছেন—আমি আপনার বোন। এই বিপদের মুহূর্তে বোনকে বাঁচানো ভাইয়ের কর্তব্য। আপনার তা অজানা থাকবে কেনো? জানি আপনি পত্রপাঠ মাত্র আসবেন। বোনকে বাঁচাবেন। আজ থেকে আপনি আমার বড়ো ভাই। এর চেয়ে বড়ো সত্য নাই।

বেগম সাহেবা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। ছোট বোনের আহ্বান। অগ্রজ তাই তড়বড়িয়ে ছুটে গেছেন। কোনো বাধা-বিঘ্ন মানেননি। কোনো বিধি নিষেধের ধার ধারেননি। ছোট বোনের দাবী অগ্রগণ্য। বড়োর বিপদ আসে আসুক তাতে কি আসে যায়।

চিতোর অবরোধ করে বাদশাহ তখন সসৈন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছেন। মার মার করে এগিয়ে চলেছে মোগল বাহিনী। বাদশাহ স্বয়ং সেনাপতি-সিপাহসালার।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। বাদশাহ তাঁর ছোটো বোনের দেখা পেলেন না। তাঁর অনেক আগে রাণী কর্ণবতী জহর পান করেছেন। বিজয়ীর বেশে বাদশাহ হুমায়ুন চরম পরাজয় বরণ করলেন। স্নেহের ছোটো বোনের সম্মান রাখতে পারলেন না। বড়ো ভাইয়ের ব্যর্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

রাণী কর্ণবতীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বাদশাহ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছেন। বিরাট মোগল বাহিনীর হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। অশ্রুর আঘাতে তার শির-দাঁড়া যেন ভেঙ্গে গেছে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে বাদশাহ হুমায়ুন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কোথায় সে বেঈমান বাহাদুর শাহ। হোক সে আমার জ্ঞাতি—তাকে সমুচিত সাজা দাও। বন্দী করো বাহাদুর শাহকে। আমার বোনকে সে অপমান করেছে। আমার বোন তার কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। এ আঘাত আমি ভুলতে পারি না।

বাহাদুর শাহ জানতেন না যে, মোগল সম্রাট হুমায়ুন সসৈন্যে ছুটে আসবেন। দিল্লী থেকে চিতোর অভিযান করবে দুর্ধর্ষ মোগল বাহিনী। তাছাড়া তাঁর অটুট আস্থা ছিলো, মোগল অধিপতি মুসলমানের কর্ণধার। মুসলিম জাহানের পুরোধা প্রতিভূ। সর্বোপরি পৃষ্ঠপোষক। অন্যদিকে রাজপুত রাণী বিধর্মী। মুসলমানের চিরশত্রু রাজপুত। বাহাদুর শাহ সে সব সম্যক বুঝে আক্রমণ করেছিলেন চিতোর। রাণী কর্ণবতী সহজে পরাজয় বরণ করবে তা তিনি জানতেন। শুধু জানতেন না বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। অতোবড়ো বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি হবেন চির বৈরী চিতোর রাণীর আদর্শ অগ্রজ।

বন্দী বাহাদুর শাহের বিস্ময় কাটেনি। তিনি ভেবে কূলকিনার পান না। মোগল অধিপতি কেমন করে বিধর্মী বোনকে স্বীকার করে নিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন তখনো রাণী কর্ণবতীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। তাঁর কান্না কণ্ঠে পবিত্র

কালামুল্লাহর পূত বাণী। সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি অবশেষে বললেন—আমার প্রার্থনা, আমার বোনের আত্মা যেন শান্তি পায়। একদিন আখেরাতে নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে। তখন সে অকপটে বুঝতে পারবে, ভাইয়ের কর্তব্য আমি করেছি। বিপন্ন বোনকে বাঁচানো ছিলো আমার দায়িত্ব। আমার ওয়াদা। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি তা পালন করেছি। সে বিধর্মী হলেও আমার বোন। সে বেঁচে থাকলে তা বুঝতে পারতো। রোজ হাসরের ময়দানে সে সঠিকভাবে আমাকে সনাক্ত করতে পারবে। তখন সে বুঝবে, মোমিন মুসলমান কখনো বেঈমানী করে না। আর মুসলমান কখনো জালিমকে ক্ষমা করে না। হোক না সে জালিম মুসলমান।

বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজীর মহত্ত্ব ও মহানুভবতা

বিশ্বের ইতিহাসে বখতিয়ার খিলজী একটি বিশিষ্ট চরিত্র। বিশেষ ব্যক্তিত্ব। শৌর্য-বীর্যে তাঁর তুলনা বিরল। তিনি জয় করেছেন। জয়ী হয়েছেন। বিজেতার দম্ভ তবু তাঁর ছিলো না। বিজিতের প্রতি দরদ ছিলো সীমাহীন। বিজাতীয় ঘৃণা সেখানে স্থান পায়নি। বিদেশী বলেও তাঁকে বুঝতে পারেনি। তাঁর স্বল্পকালীন সুশাসনে রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আপন অধিকার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো প্রতিটি মানুষ। পরম আত্মীয়সম তাঁকে গ্রহণ করেছিলো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জনসাধারণ।

বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা বখতিয়ার খিলজী। বহু দূর-দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন এ দেশে। মাত্র কয়েকজন সংগী নিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন সমগ্র পশ্চিম-উত্তর বঙ্গ। হিন্দু ঐতিহ্যের পাদপীঠ নবদ্বীপধাম অতর্কিতে অভিযান তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয়। এতো স্বল্প সময়ে স্বল্প সংখ্যক সেনার সাহায্যে বিরাট দেশ দখল করার নজীর নেই।

তখন অবশ্য কেউ ভাবতে পারেনি বিজেতা সিপাহ-সালার হবেন দেশের মানুষের একান্ত আপনজন। বিজয়ী বখতিয়ার খিলজী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

হিন্দু রাজার হাত বদল হয়ে মুসলমান শাসকের হাতে রাজ্য চলে যাওয়ায় সমূহ সন্দেহের কারণ ছিলো বৈ কি। প্রথম প্রথম তাই তাঁকে অনেকেই সুনজরে দেখেনি। হিন্দু প্রধান নবদ্বীপধামে মুসলিম রাজত্ব কায়েম অনেকের কাছে ভীতি সঞ্চার করেছিলো। বিজয়ী বখতিয়ার খিলজী সবার মন থেকে মুছে ফেলেছেন সেই অমূলক ভয় সংশয়। সংগে সংগে মুসলমানের বিজয় অবদান রেখে গেছে মুসলিম বাংলায়। প্রথম পথিকৃত হিসেবে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন মুজাহিদ মুসলমান বীরের জাতি। বীরত্বের প্রতীক। তেজ-তলোয়ারের জোরে নয়; মুসলিম জয় করতে পারে ভালোবাসা আর দরদ দিয়ে। বৈরী বিধর্মীকে আপন করে নেয় ত্যাগের মহিমায়। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রমাণ বিজয়ী বীর দালিয়ার মুসলমান দিয়ে আসছে বিজয়ের দম্ভ-দর্প তাতে লেশমাত্র পরিদৃষ্ট হয়নি। সাম্য-মৈত্রীর মহিমায় সে বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছে মুসলিম জাহান। আর বিজয়ের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে ইসলামের সৌন্দর্য।

বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ে মুসলিম বাংলার প্রতিষ্ঠা তাঁরই অনন্য নিদর্শন। বহু সমৃতি-কীর্তির সমন্বয়ে ভাস্বর সেই বিজয়ের ইতিহাস। বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের কাহিনী আরো পরিব্যাপ্ত। আরো প্রশংসাধন্য। পুরোপুরি তা প্রকাশ করা সীমিত পরিসরে সম্ভবপর নয়। আলোচ্য অংশে সেই সুবিশাল মহিমামন্ডিত চরিত্রের ছিঁটে-ফোটা তুলে ধরা হয়েছে।]

লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে আসছে লাল ফৌজ। মাথায় মাথায় লাল পাগড়ী। পরনে লাল পোশাক। লালে লাল হয়ে গেছে সব।

চারদিকে সংবাদ রটেছে। তেড়ে আসছে জংগী জোয়ান। পাট্টা পাঠান মুসলমান। এবার বুঝি নিস্তার নেই। কারো গর্দান থাকবে না। লাল ফৌজ লুটে নেবে গোটা দেশটা। দেশের মানুষের দুর্দশার শেষ থাকবে না।

ভরা ভাগীরথীর তীরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে কতো কুল-নারী। কতো ললনা! ভাগীরথীর পারাপার লোকে লোকারণ্য। গঙ্গায় ডুব দিয়ে না হয় জ্বালা জুড়াবে। সাধু সন্ন্যাসীদের মুখে এক কথা। মরতে চাও মরো। মরবার জন্য প্রস্তুত হও। তবু যবনের হাতে মার খাবে না।

কাটোয়া কালনার পথে সেই সোরগোল, সেই কলরোল। পাঠান সেনারা আসছে। ওই এলো! ওই এসে পড়লো। যে যেখানে আছো সরে পড়ো। সময় থাকতে সাবধান হয়ে যাও। পালাও। পালাও।

চারদিকে চিৎকার আর আর্তরব। নদীয়ার লোকজন ঊর্ধশ্বাসে পালাচ্ছে। বোষ্টম-বোষ্টমীরা আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ঢোল করতাল কীর্তন বন্ধ হয়ে গেছে সব। একজনের সাথে আর একজনের দেখা হলে শুধু বলে—কি সংবাদ। চুপি চুপি জানতে চায় আর কতো দূরে আসছে। আর কতো দেরী। প্রাণটা নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। গোটা তল্লাটে পালাবার হিড়িক পড়ে গেছে। ঘরের মানুষ ছুটছে। পথের মানুষ ছুটছে। মাঠের মানুষ ছুটছে। পিছনে পিছনে সিপাই সান্ত্রীরা ছুটছে।

সতেরোজন অশ্বারোহী অবশেষে এসে পড়েছে সিংহদ্বারে। বাধা দেবার মতো বুঝি কেউ নেই। প্রহরী পলাতক। দ্বারী উধাও। লোক-লস্কর লাপাত্তা।

সরদার ঘোড়-সওয়ার সরাসরি খবর পাঠালেন অন্দরে। বিশেষ দূত যাচ্ছে রাজার কাছে। তাঁর সাথে সসম্ভ্রমে কথা বলবেন। তাঁর অভিরুচি জানবেন। তাঁদের আগমন বার্তাও জানাবেন।

রাজা লক্ষণ সেন তখন খেতে বসেছেন। দোঁড় দিয়ে দাসী এলো কাছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সে দেখেছে ওরা এসেছে। এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে ভিতরে।

শোনামাত্র লক্ষণ সেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। থাক্ পড়ে রাজবাড়ী। থাক্ পড়ে তার রাজদন্ড। পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেলেই হলো।

অনেক্ষণ অপেক্ষা করেও কারো পাত্তা পাওয়া গেলো না। প্রাসাদপুরী শূন্য। জন-মানবের চিহ্ন বলতে নেই। সব পালিয়েছে। সব সরে পড়েছে।

সরদার ঘোড়-সওয়ার তবু তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। অন্ততঃ একজনকে পেলে তিনি খুশী হন। একজন মানুষের মুখ দেখলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কাউকে না পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে।

সতেরো জন অশ্বারোহী বিপন্ন বিস্ময়ে খোঁজাখুঁজি করছেন। রাজবাড়ীর লোকজন গেলো কোথায়? নদীয়ার আউল-বাউল কোথায় পালালো? রাজার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এতো ভীরু। এতো ভীতু। ক্লীব-কাপুরুষের দল।

দিনের শেষে অশ্বারোহীরা ভরা ভাগীরথীর তীরে এসে দাঁড়ান। যতো দূরে দৃষ্টি যাচ্ছে শুধু মানুষের মিছিল। ভাগীরথীর ওপারে মানুষের মেলা বসেছে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে করুণ কান্না ভেসে আসছে কানে।

সরদার ঘোড়-সওয়ার আর দ্বিধা করলেন না। সৈনিকের সাজ-সজ্জা খুলে ফেললেন। পরিধানে তাঁর সাধারণ পোশাক। রাতের অন্ধকারে নদী পার হয়ে ওপারে উঠলেন। স্বচক্ষে তিনি দেখতে চান অবস্থা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

না। তিনি যা ভেবেছিলেন, তা নয়। ওরা রাজার জন্যে বিলাপ করেনি। রাজার প্রতি আনুগত্য ওদের নেই। ওরা ভাবছে—যবন এসেছে দ্বারে। ওদের ধারণা, যবনের হাতে যখন পড়েছে তখন জাত খোয়াবে। জাত যাবে।

সেই রাত্রেই ঢ্যাড়া পিটিয়ে দেয়া হলো। জনশূন্য নদীয়ার পথে পথে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো। যে যেখানে আছো ফিরে এসো। যার যার ঘরে ফিরে যাও। নতুন রাজার আদেশ নির্দেশ অমান্য করে কার সাধ্যি। বিশেষভাবে তখন তারা সাহস পেয়েছে। রাজার তরফ থেকে সব রকমের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

দিনে দিনে দেখা গেলো লোকজনের ভিড়। নিজের নিজের ঘরে ফিরছে অনেকে। ঘরে ঘরে আবার জ্বলছে সন্ধ্যা-প্রদীপ। দোকান পাট-পথঘাট আলোয় আলোয় জ্বল-জ্বল করছে। নদীয়া ধাম জমজমাট হয়ে উঠছে।

সরদার ঘোড়া-সওয়ার মাঝে মাঝে সব খোঁজ-খবর নেন। কখনো কখনো সংগে সহজভাবে। কখনো বা আশ্রমে আড্ডায়

দুদন্ড বসেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সাবাস দেন। সাহস যোগান।

নদীয়া ধামের মানুষ আবার জেগে উঠেছে। প্রাণে প্রাণে জেগেছে জীবনের জোয়ার। একজনের সাথে আর একজনের দেখা হলে তখন বলে যবন কোথায়? এ বাড়ী ও বাড়ী, এ পাড়া ও পাড়ার লোকে বলাবলি করে, যবন যদি হয় তবে যবনই ভালো। আমরা যবনের হাতে বেশ ভালো আছি। আউল-বাউল বোষ্টম-বোষ্টমীরা সুর করে গান ধরে, ও-ভাই মুসলমান আমাদের জানের জান।

রাজ্যের সুখের সংবাদ চাপা থাকলো না। সর্বত্র সুখের সংবাদ ছড়িয়ে গেলো। পদ্মা যমুনা পার হয়ে পেঁছিলো রাজা লক্ষ্মণ সেনের কানে। রাজমাতা শুনলেন, রাণী শুনলেন। নিতান্ত অবিশ্বাসের মাঝেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। এরই মধ্যে বিশ্বস্ত প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। বিশ্বাস না করে পারেন?

লক্ষ্মণ সেনের একমাত্র কন্যা শুনে উতলা হয়ে উঠেছেন। তাঁর স্থির সংকল্প তিনি ফিরে যাবেন সাধের নবদ্বীপ ধামে। রাজবাড়ী না হোক, রাজপথেই বাসা বাঁধবেন। তবু দূর প্রবাসে থাকবেন না। জন্মভূমির টান সবচেয়ে বড়ো।

একদিন সত্যি সত্যিই দেখা গেলো রাজবাড়ীতে কে যেনো চুপিসারে ঢুকছে। প্রহরী রুখে দাঁড়ালো, কে, কি তার পরিচয়। রাজ-দুহিতা নির্ভয়ে জানালেন—যা বলার তিনি রাজার কাছে বলবেন। তাঁর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান।

দ্বার রক্ষক তাঁকে সসম্মানে নিয়ে চললো রাজ সন্দর্শনে। সংবাদ নিয়ে বললো একটু অপেক্ষা করতে। একটু পরে উনি আসছেন।

রাজ-দুহিতা দেখতে পেলেন কে যেনো নামাজ পড়ছেন। খোলা দরজা দিয়ে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। সৌম্য প্রশান্ত বদন। সুললিত কণ্ঠস্বর।

এরপর রাজদুহিতার আরো অবাক হবার পালা। নামাজ শেষে সেই ব্যক্তিই তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন। তিনি বিনম্রভাবে তাঁকে আহবান জানাচ্ছেন অন্দরে আসতে।

অসংকোচে রাজদুহিতা বললেন—তিনি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

সরদার ঘোড়-সওয়ার আবার আপ্যায়ন জানালেন—আসুন, ভিতরে আসুন।

সে কণ্ঠে কি যাদু ছিলো কে জানে। রাজদুহিতা সম্মোহিতের মতো তাঁর পিছু অনুসরণ করলেন। এ বাড়ীর সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। সব অলিগলি, আনাচকানাচ তাঁর কতো চেনা। কতো না আপন।

সেই বিশাল হলঘরে বসে রাজদুহিতা অবাক হলেন। সেহ আগের মতোই সব সাজানো গোছানো আছে। সবকিছু পরিপাটী ছিমছাম।

এ কথা সে কথার পর রাজদুহিতা তাড়া দিলেন—রাত হয়ে এলো। আমি এবার ফিরে যাবো। একবার শুধু রাজার দেখা চাই। দু'দন্ড শুধু তাঁর সাথে কথা বলবো।

কথায় কথায় রাজদুহিতা অবশ্য মুগ্ধ হয়ে গেছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিচয়। আনন্দের আতিশয্যে এতোটুকু গোপন রাখেননি।

কথার পিঠেই কথা দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার দুঃখ প্রকাশ করলেন। সত্যিই রাত হয়েছে, তাঁর খেয়াল হয়নি। তিনি অনুতপ্ত।

এবার সাদর আহিবান এলো—আসুন। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আর আপনার আহারের আয়োজন হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তারপর রাজদুহিতাকে হতচকিত করে দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার তাঁর হাতে তুলে দিলেন চাবীর গোছা। পরম প্রত্যয়ের সুরে বললেন—যে ঘরে ইচ্ছা আপনি থাকতে পারেন। যে ঘর আপনার পছন্দ, সেই ঘর বেছে নিন। আর যে পাচক-পাচিকাকে প্রয়োজন তাকে দিয়েই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করুন। এ ঘর-দোর আপনাদের। আমি রক্ষণাবেক্ষণ করছি মাত্র।

বিনয়ে বিগলিত রাজদুহিতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, যাকে খুঁজছেন তাকে পেয়েছেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যিনি সবার হৃদয় জয় করেছেন, এই সেই বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী। নদীয়া নবদ্বীপ ধাম অভিযানের সরদার ঘোড়-সওয়ার, যার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

তারপরে এ কথা সে কথার পরে রাজদুহিতা সহাস্যে বলেন—আমরা যে অলক্ষ্যে বলি আপনি যবন, তা জানেন ?

তেমনি হাসিমুখেই বখতিয়ার খিলজী জানালেন—জানি। আর জানি বলেই তো আপনাকে পেয়েছি। আমার সব পরিচয় নিঃশেষে জেনে যান।

রাজদুহিতা বললেন—আপনি মুসলমান। আর আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে। বরং বলতে পারেন আপনার চির শত্রুর কন্যা। তবু আমরা নতুন করে জানলাম—আপনি সত্যি মহান, মহানুভব। আপনার তুলনা হয় না। আপনি

খাঁটি মানুষ। খাঁটি মুসলমান। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

বখতিয়ার খিলজীর চোখে মুখে তখন জয়ের গৌরব। পবিত্র ইসলামের পূত বাণী স্মরণ করে তিনি বললেন—আল্লাহ্‌র কাছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সব মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসার নাম ইসলাম। আমি তাঁরই একজন নগণ্য খাদেম। ইসলামের শিক্ষাই আসল শিক্ষা।

———

মানবতার মহান প্রতীক বাদশাহ্ নাসিরুদ্দিন

[বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েও বাদশাহ নাসিরুদ্দিন ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। আরাম-আয়েশকে হারাম বলে জানতেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন মহৎ চরিত্রের সন্ধান মেলে না। বাদশাহ নাসিরুদ্দিন নিজেই এক ও একক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

তথাপি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধারণা ছিলো—তিনি গোঁড়া মুসলমান। ইসলামের খাঁটি অনুসারী তাদের অখন্ড প্রত্যয় বাদশাহ মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। মুসলমানরা তাঁর সত্যিকারের পেয়ারের প্রজা। আর রাজ্যের অপরাপর অধিবাসীরা তাঁর কাছে অবজ্ঞার পাত্র। ন্যায়-বিচার-বিবেচনা তারা পায় না।

বাদশাহ নাসিরুদ্দিন তা বুঝতেন। তিনি জানতেন, জাত হিন্দু-জাঠ-শিখদের মনের ভাব। তাদের আক্রোশ আর অভিমান মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

তবু বাদশাহর দরবার ছিলো সবার জন্যে উন্মুক্ত। সব সময় তিনি সুযোগ দিতেন অন্য ধর্মাশ্রয়ীদের। সব রকমের সাহায্য-সুবিধা তাদের দিতেন। তারা যেনো বুঝতে পারে মুসলমান বাদশাহ শুধু মুসলমানের নয়। তিনি সব

ধর্মের, সব মানুষের। রাজা-প্রজার সম্পর্ক সেখানে সুমধুর হবে। রাজা-বাদশাহ হবেন প্রজার পরমাত্মীয়জন।

বিশেষ করে বাদশাহ নাসিরুদ্দিন তাঁর বিঘোষিত আইন-কানুনে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিধান ছিলো সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যে সমান অধিকার। রাজকাজে স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুসারে মানুষের স্থান। প্রতিভার সমাদর সেখানে অগ্রগণ্য ছিলো। প্রতিভাধরদের তিনি অগ্রাধিকার ও সর্বোচ্চ সম্মান দিতেন।

বাদশাহ নাসিরুদ্দিনের আমলেই অন্যান্য ধর্মমত পোষণ-কারীদের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত আলাদা আইন পাস করা হয়। দীন-হীনদের রাজকোষ থেকে মাসোয়ারা দেয়ার অত্যাবশ্যকীয় বিধান প্রণীত হয়। মাঝে মাঝে বাদশাহ নিজে তা তদারক করতেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে যে সব কার্য সম্পাদন করা হতো, তাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মনে ক্রমে ক্রমে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মায়। রাজ্যে নিশ্চিত আস্থা আসে। রাজ্যজুড়ে শান্তির স্রোতধারা বয়ে যায়।

বাদশাহ নাসিরুদ্দিন দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহর দরবারে শোকর গোজার করেন। ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য কোন কিছুই তাঁর কাম্য ছিলো না। তিনি দুহাত তুলে শুধু চাইতেন রাজ্যের মানুষের সুখ-শান্তি। মানুষকে সর্বতোভাবে সুখী করাই ছিলো তাঁর আজন্ম সাধ-সাধনা।

ইতিহাসের পাতায় বাদশাহ নাসিরউদ্দিনের নাম তাই অমর। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস তাঁকে সম্মানের সাথে স্মরণ করবে। ভাবীকালের মানুষ তাঁর মানবতার যথার্থ মূল্যায়ন করবে সন্দেহ নেই। মহাপুরুষ হিসেবে তিনি চিরদিন আপ্যায়িত হবেন।

এখানে শুধু তাঁর বহুগুণে গুণান্বিত জীবনের একটি দিক সম্পর্কে ইংগিত দেয়া হলো। যেখানে বাদশাহ অতি অল্পেই প্রমাণ করতে পেরেছেন তিনি হিন্দুর নন, তিনি মুসলমানের নন। তিনি সব মানুষের আপনজন। তাঁর কাছে জাতি-ধর্মের বৈষম্যের চেয়ে বড়ো হলো মানুষ। ইসলাম যে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে ঘোষণা করেছে, ইসলামের বিধান যেখানে সকলের তরে আমরা সবাই, খাঁটি মুসলমান হয়ে বাদশাহ নাসিরুদ্দিন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সত্যি সত্যিই তিনি ছিলেন বাদশাহর মতো বাদশাহ মানুষ। যথার্থ মোমিন মুসলমান।]

o o o

নিজ হাতে কুরআন শরীফ নকল করছিলেন বাদশাহ নাসিরুদ্দিন। ত্রিশ পারা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর অল্প কিছু বাকী। যেভাবেই হউক খতম না করে উঠবেন না, খালেশ দেলে নিয়ত করেছেন আজ শেষ করবেন। আজকে অবশ্যই শেষ করা চাই। তা না হলে অন্য কাজে হাত দিতে পারবেন না। নিজের টুকিটাকি সবকিছুই তাঁকে নিজের হাতে করতে হয়। নিজে কাপড় সেলাই করেন। টুপি তৈরী করেন। পিরহান পরিষ্কার করেন। আরো কতো রকমের কাজ। একটা না একটা কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। একদন্ড ফুরসুৎ নেই।

বাদশাহ্‌র সুনাম আছে কাজের মানুষ বলে। কর্মময় জীবন যাপন করেন তিনি। কর্ম আর ধর্ম তাঁর জীবনের সার। রাজ্য জোড়া মানুষ জানে বাদশাহ বিলাসী নন। বাদশাহ বিলাস-বৈভবের ধার ধারেন না। অতো বড়ো রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও নিজের রুজি নিজে রোজগার করেন।

সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় তাঁর নিজের পরিশ্রমের পয়সায়। বাদশাহ্‌র মতে রাজ্যের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের হকদার জনগণ। তিনি শুধু পাহারাদার। জনগণের সম্পদ তিনি পাহারা দিচ্ছেন। জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক তা খরচ করা হবে। তাতে তাঁর অধিকার নেই।

সে নজীর পাওয়া গেছে বহুবার। বাদশাহ্‌ বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। রাজ্যের এতোটুকু ধন-দৌলত তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন। নিজে খেটে-খুটে যা রোজগার করবেন তাই যথেষ্ট। তাই দিয়ে সংসার চালাতে হবে। বাহুল্য ব্যয় করার ক্ষমতা তাঁর কই।

ক'দিন আগেও বেগম সাহেবা একজন দাসীর জন্যে আরজি করেছিলো। বেগমের অপরাধ ছিলো না। রাঁধতে গিয়ে তাঁর হাত পুড়ে যায়। পা যখম হয়। দগদগে ঘায়ের জ্বালা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। এই কারণেই বাদশাহকে বলেছিলেন দিন কয়েকের জন্যে একজন দাসী রাখতে।

বেগম সাহেবার করুণ দশা বাদশাহ জানতেন। বেগম একেবারে কাহিল হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় একটা কুটো ভেংগে দুটো করতে অপারগ।

তবু তিনি পারলেন না। একজন মাত্র দাসী রাখাও তাঁর পক্ষে মুশকিল। তার খায়-খরচা খোরপোশ তিনি যোগাতে অক্ষম। নিজের হাতে যেটুকু কাজ করেন তাতে সংকুলান হয় না। আয় বুঝেই ব্যয় করতে হবে। সেই মোতাবেকই তিনি কাজ করেন। কাজে কখনো গাফলতি করেন না। বাদশাহ জানেন কর্মের মতো ধর্ম আর নেই।

সেদিনও বেগম সাহেবা পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কাজ-পাগলা প্রিয়তম পতিকে। বেলা গড়িয়ে গেছে। খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আর কখন খাওয়া-দাওয়া করবেন।

অথচ ডাকবার উপায় নেই। বাদশাহ বারণ করেছেন, তাকে যেন না ডাকে। বাকীটুকু শেষ করে তবে তিনি উঠবেন। তখন আহার-আরাম করবেন!

বেগম সাহেবা জানেন, সময় আর বাদশাহর হবে না। দুদন্ড অবকাশ তিনি পাবেন না। এই পাক কুরআন শেষ করেই নামাজ আদায় করবেন। তারপর আবার আর একটা কাজ ধরবেন। সবার উপরে তো আছে রাজ কাজ। কখন কিসে ডাক পড়ে বলতে পারে।

এমন সময় সত্যি সত্যি ডাক পড়লো। অপ্রত্যাশিত ডাক।

একজন লোক এসেছে। তার সাথে আর একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু। খোদ বাদশাহের সাথে দেখা করতে চায়। দেখা না করে কিছুতেই যাবে না।

রাজদ্বারী বহুভাবে বুঝিয়েছে একটু অপেক্ষা করতে। একটু ক্ষণ ধৈর্য ধরতে। কিন্তু লোকটা নাছোড়। একেবারে বসতে নারাজ। বসবার সময় যেনো তার নেই।

তবুও রাজকর্মচারীরা বাধা দিয়েছে। বার বার অনুরোধ জানিয়েছে। রাজকর্মচারী জানতো বাদশাহর তখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি। বাদশাহ বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন। বাদশাহকে বিরক্ত করা বেয়াদবী হবে।

শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌র কানে গেল সেই হাঁক-ডাক। পবিত্র কালামুল্লাহর উপর চুমু দিয়ে তিনি উঠলেন। পায়ে পায়ে

এসে দাঁড়ালেন বাইরে। স্বচক্ষে দেখলেন খালি গায়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তার নাংগা আদুল দুধের মাসুম ছটফট করছে।

বাদশাহ তড়িঘড়ি হুকুম দিলেন, ওদের খাবার দিতে। বেগমকে এসে বললেন, তাঁর নিজের জন্যে যে রান্না তা এক্ষুনি দিয়ে দাও। বেচারীরা বহু দূর থেকে বুঝি এসেছে। ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে কোলের শিশুটা।

কিন্তু আগন্তুক সে খাবার খেতে রাজী নয়। সে জানালো, সে জাতিতে হিন্দু। বাদশাহ-বাড়ীর পাক খেলে তারা বিপাকে পড়বে।

বাদশাহ বললেন, বেশ। তাহলে তোমরা রান্না-বান্নার আয়োজন করো। যা যা প্রয়োজন লাগে হাজির হবে। একটুখানি শুধু কষ্ট করতে হবে।

আগন্তুক আবার বললো—তাও হয় না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। আর আপনি দাস মুসলমান। আপনার ঘরে খাওয়া মানে আমার জাত যাওয়া।

বাদশাহ এক মুহূর্ত ভাবলেন। পরে বললেন—আচ্ছা ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি আনুক। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর কথা হবে। আমি ততোক্ষণে আসি।

বাদশাহ ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দিয়ে নামাজ পড়ে নিলেন। সব বাদশাহ্‌র বাদশাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলেন। তিনি যেনো মাফ্ করেন। সারা মন-প্রাণ দিয়ে মাফ্ চান।

অবশেষে আগন্তুক তার আরজি পেশ করেছে। তার নালিশ জনৈক রাজপোষ্যের বিরুদ্ধে। তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে সে জন। তার বাড়ীঘর ছারখার করে ফেলেছে। রাজদরবারে এর সুবিচার চাই।

বাদশাহ তখনি তৈরী হয়ে নিলেন। সরেজমিনে তিনি সব জানতে চান। তারপরে কথিত আসামীকে কঠোর সাজা দেবেন।

আগন্তুক হয়তো এতোটা ভাবতে পারেনি। বাদশাহ নিজে যাবেন বিচার করতে, এ তার কল্পনার অতীত। হিসেব নিকেশে সে বড্ডো ভুল করে ফেলেছে। কি করতে কি হলো।

বাদশাহ সেখানে পেঁাছে সংগে সংগে সাক্ষ্য প্রমাণ নিলেন। জনে জনে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার, কি ঘটেছে।

লোকে বললো—ও লোকটা শঠ। শয়তান। পরের সাথে প্রতারণা করা ওর পেশা। এমনি করে ওর দিন গুজরান হয়।

স্বয়ং বাদশাহকে তকলিফ দেয়ার জন্যে লোকে ততোধিক ধিক্কার দিলো। বাদশাহর কাছে তারা করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী, বাদশাহ যেনো ক্ষমা করেন।

তাদের সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে বাদশাহ বললেন—চলো ভাই, তোমার বাড়ীতে বসি। সেই সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তোমার বাড়ীতে দুটো মুখে দিই।

বাদশাহকে কিছু খাওয়ানোর মওকা পেয়ে লোকে তখন ছুটোছুটি করছে। বাদশাহ কি খাবেন, এই চিন্তাতে সবাই মশগুল।

বেশীক্ষণ বাদশাহ অবশ্য অপেক্ষা করলেন না। তাঁর যে এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে। হাতে অনেক কাজ। তাছাড়া নামাজের ওয়াক্ত হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া চাই।

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বসে বাদশাহ তাকে নিরিবিলি বললেন—তোমার কোন ভয় নেই। দোষ তোমার নয়, আমার। আমি

বাদশাহ হয়ে তোমার অভাব মেটাতে পারিনি। আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করবেন কিনা জানি না। তবে তুমি আমাকে মাফ করো।

ব্রাহ্মণ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাদশাহর পায়ে। বাদশাহ তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন—ছিঃ ভাই, ওঠো। আমার যে কিছুই খাওয়া হয়নি। কই কিছু খেতে দাও। ঘরে যা আছে তাই আমি খাবো। আর বসবার সময় নাই।

ব্রাহ্মণ কেঁদে কেটে বলে—আমি অশুচি-অপবিত্র। আমার হাতে আপনি খাবেন।

বাদশাহ হেসে বলেন—ছিঃ ভাই, মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করে। ইনকার করে। ইসলাম তা বলে না। ধর্মের বিধান তা নয়।

বাদশাহ তারপর সংগে নিয়ে আসলেন সেই ব্রাহ্মণকে। তাকে বুঝিয়ে বললেন—সে যেনো আর কোনো গর্হিত কাজ না করে। তার যখন যা প্রয়োজন বাদশাহর কাছে পাবে। বাদশাহকে তার সব ভার যেনো ছেড়ে দেয়।

বাদশাহর কথায় গলে গিয়ে ব্রাহ্মণ বলে—আপনি পাক্কা মুসলমান। পাক্কা মানুষ। আগে জানতাম না। আজ জানলাম। আপনাকে হাজার সালাম।

———

সুলতান মাহমুদের বিজয় অভিযান

[গজনীর সুলতান মাহমুদ। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ আর পরাক্রম। দুরন্ত দাপট। স্বদেশের সম্মান তিনি বিঘোষিত করেন দুনিয়ার দরবারে। গজনীর উচু শির দেদীপ্য হয় জাহান জুড়ে। তাঁর সাহসের সাথে সোনায় সোহাগার মতো মিলে যায় সর্বান্তঃকরণের সৌন্দর্য। দেশ-বিদেশের গুণী-জনকে তিনি জড়ো করেছেন স্বীয় সাম্রাজ্যে। সেখানে তাঁদের বিপুল সমাদর। বিরাট প্রতিষ্ঠা। সুলতান সসম্মানে বরণ করেছেন জ্ঞানী-গুণিগণের। সসম্মানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে তাঁদের স্থান।

সুলতান মাহমুদের সখ যেখানে প্রতিভার প্রাণ পাবেন সেখানেই ছুটে যাবেন। তাঁদের নিয়ে আসবেন আপন আলয়ে। তাঁর রাজসভা-রাজদরবার অলংকৃত করবেন তাঁরা।

এই একই কারণে সুলতান স্বদেশ ছেড়ে বারবার বিদেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। বিজয়ীর বেশে পরে ফিরে গেছেন স্বদেশে। তাঁর সারামুখে তখন ফুটে উঠেছে বিজয়ের হাসি। হাসতে হাসতে অনেক সময় তিনি পরম সখা সুহৃদ জ্ঞানী আলবেরুণীকে সে-কথা বলেছেন। স্বীকার করেছেন শহীদের লাহুর চেয়ে বিদ্বানের মসী পবিত্রতর। তাঁর যুদ্ধ জয় শুধুমাত্র সেই বিদগ্ধজনদের জন্যেই।

সুলতান মাহমুদ এই উপ-মহাদেশে সতেরোবার অভিযান করেছেন। পই-পই করে খুঁজেছেন, কোথায় পাবেন সেই অমূল্যধন গুণী-জ্ঞানীজন। তাঁদের সন্ধান পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

অথচ লোকে তখন তাঁকে ভুল বুঝেছে। লোকে ভেবেছে সুলতান লুন্ঠনকারী। লুটপাট করা তাঁর পেশা আর নেশা। নানাভাবে নানা অপবাদ দিতে কেউ কসুর করেনি। সমকালীন ইতিহাসের আস্তাবলে জমা হয়েছে সুলতানের নামে অনেক আবর্জনা-জঞ্জাল।

কিন্তু কালের কবলে তা কতোদিন টিকে থাকবে। এক সময় না এক সময় সত্য প্রকাশ পাবে। সত্যের মৃত্যু নেই। সত্য চির-ভাস্বর।

সুলতান মাহমুদের সদগুণাবলীও সেইরূপ দেদীপ্যমান হবে। সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাঁর অমর কীর্তি-কাহিনী। আদপে তিনি লুন্ঠনকারী ছিলেন না। লুন্ঠন করা তাঁর স্বভাব ছিলো না। এক অর্থে তিনি লুন্ঠন করতেন পৃথিবীর প্রথম সারির প্রতিভাবিদদের। প্রতিভার জন্যে তিনি ছিলেন পাগল।

আর এই দুর্বিনীত নেশার দায়ে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। দুর্নাম কুড়িয়েছেন তারও বেশী। দুর্মুখরা যারপরনাই দোষ দিতে কসুর করেনি। সুলতান মাহমুদ তাদের চোখে শুধু সন্ত্রাস।

অপরদিকে সুলতান মাহমুদের সার্থক অভিযান তাঁকে সম্মানের শিরোপা পরিয়ে দিয়েছে। কাপুরুষের মতো কলংক মাথায় বয়ে পালিয়ে বেঁচেছে পরাজিত রাজ-রাজড়া। পলায়নের পথে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে। স্বয়ং সুলতান

তাদের সে সুযোগ দিয়েছেন। সত্যিকারের ইতিহাস সেখানে স্তব্ধ। কৃত্রিম মৌন-ম্লান।

অবশ্য অতীতের অন্ধকারের বুকে আগামীদিন জ্বালিয়ে দেবে আলো। সুলতান মাহমুদের উজ্জ্বল চরিত্র তাতে প্রতিভাত হবে। সেদিন সত্যি সত্যিই দীপ্তিময় হয়ে উঠবে, তিনি শুধু মহাবিজয়ী বীর ছিলেন না—তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। খাঁটি মানুষ। মানবতার যথার্থ মর্যাদা তিনি সর্বক্ষেত্রেই দিয়েছেন। বিশদভাবে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এখানে কেবলমাত্র তার একটুখানি চিত্রিত করা হলো। যা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে, সুলতান মাহমুদের চরিত্র অগৌরবের নয়। বিস্ময়কর মহৎগুণে সমৃদ্ধময়। হিন্দু-মুসলমান, জাঠ-শিখ সবাই তাঁর চোখে ছিলো সমান। ভেদ-বিভেদের কুপমন্ডুকতা ছাড়িয়ে সবাইকে তিনি সমানভাবে সমাদর করেছেন। পরাজয় বরণকারী চির-বৈরীকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিজ হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার আপন অধিকার। ইসলামের আদর্শে আস্থা রেখে জয়ের গৌরবে বিজাতীয় জীঘাংসা চরিতার্থ করেননি। তাঁর আদর্শের অবক্ষয় অসম্ভব।]

o o o

সোমনাথ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সুলতান মাহমুদ। পিছন ফিরে দেখছেন অনেক অব্যক্ত স্মৃতির সমাহার। দৃশ্য থেকে যা দৃশ্যান্তরে হারিয়ে গেছে। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে অনেক কথা কাহিনী। অনেক অনেক ঘটনা। পিছনে পড়ে আছে রাশি রাশি স্তূপীকৃত স্মৃতির জঞ্জাল। বার বার যা তাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়েছে। পীড়িত করেছে। যে আঘাতে তিনি বারবার আহত হয়েছেন। তত্যোধিক

আহত হয়েছেন তার সংগী-সাথী। তার সেনাবাহিনী। তারা জানে বারবার এই অভিযান অহেতুক নয়। তারা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে এ অভিযান যেন সার্থক হয়। গজনীর সম্মান তারা রাখবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বদেশের সম্মানে তারা সমান-ভাবে সম্মানিত হবে।

কিন্তু সোমনাথের মানুষ ভাবে অন্য কিছু, তাদের বদ্ধমূল ধারণা, সুলতান মাহমুদ গোঁড়া মুসলমান। সুলতানকে তারা জানে নৃশংস ঘাতক হিসেবে। সুলতানের সামনাসামনি দুটো কথা বলতে তারা ভয় পায়। সুলতান কি সর্বনাশ না করেন।

সেই ভয়েই শুধু তারা ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে। যে যে দিকে পারছে পালাচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের বুঝ মানাতে পারা যাবে না। তারা বুঝবে না সুলতান মাহমুদ মানুষকে ভালোবাসে। মানুষের মতো মানুষের মর্যাদা দেয়। দেশ-বিদেশের গুণী জনকে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে বরণ করে। যার যতোটুকু প্রাপ্য তাকে তা দিতে কুন্ঠাবোধ করে না।

সে প্রমাণ সুলতান বহুবার বহুভাবে দিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি অভিযানের সংগী মনীষী আলবেরুনী তা জানেন। সুলতান মাহমুদের সাথে সাথে সব সময় তিনি থাকেন। সুলতানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। কোনো কিছুই তার অজানা নেই। তিনি সবকিছুই অবগত আছেন। সব ঘটনা তার নখদর্পণে। মনীষী আলবেরুনী দেখেছেন সুলতানের কীর্তি-কান্ড। দেখেছেন, সুলতান কখন কোথায় কি করছেন। দেখেছেন, সুলতানের সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযান। দেশ জয়ের পুরোভাগে তারা এদেশের মানুষকেও জয় করতে চেয়েছিলো। দেশের মানুষের মন জয় করার দুরন্ত স্পৃহা তাদের।

কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। স্বয়ং সুলতানও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ দেশের মানুষ তার কাছে ভিড়েনি। কাছাকাছি আসতে দারুণ ভয় পেয়েছে। কি সান্ত্বনা তাদের দেবেন। সান্ত্বনার বদলে তারা তো সন্ত্রস্ত হয়েছে।

সুলতান জানেন একদিন না একদিন তাদের ভুল ভাংগবে। সেদিন তারা অবহিত হবে এই অমূলক আশংকার পিছনে রয়েছে অনেক কারণ। সুদীর্ঘ কাল ধরে তাদের উপর চলেছে জুলুম। এ দেশের রাজন্যবর্গ তাদের উপর একটানা নির্যাতন চালিয়েছে। একদিন তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সে সত্য একদিন ইতিহাস স্বীকার করবে। এই অভিযানের সুফল সম্পর্কে সুলতান স্বীকৃতি পাবেন। তবে আজ নয়, সেদিন আসতে অনেক দেরী। অনেক কাল লাগবে। কে জানে কবে সেদিন আসবে ?

ভাবতে ভাবতে সুলতান মাহমুদ দৃষ্টি বাড়ান আল-বেরুনীর দিকে। এখন একমাত্র ভরসা সে। একমাত্র তিনিই সদুত্তর দিতে পারেন। সুলতান যে কোন সমস্যায় পড়লে সমাধান তো তিনিই করেন।

সুলতান মাহমুদ তবু নিশ্চুপ থাকেন। বুক ফাটলো. তার মুখ ফুটলো না। তিনি কেবল তন্ময় হয়ে ভাবছেন। সোমনাথের মানুষ তাকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা সাহস করে কাছ ঘেঁসছে না।

অথচ আগেভাগেই তিনি খবর পাঠিয়েছেন। কারো কোনো কুন্ঠার কারণ নেই। কারো কোনো অসুবিধা হবে না। অহেতুক অত্যাচারের পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি মুসলমান। তিনি মহাবীর। সবার উপরে তিনি মানুষ।

কিন্তু কার কথা কে শোনে ? ওরা নির্বোধ বলেই শুনছে না। শুধু শুধু পালাচ্ছে। সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিতও পালিয়েছে। এই ষোলবারের অভিযানে তিনি কেবল দেখলেন ওই পালাবার উৎসব। পলায়নপর দুর্বলরা তাকে অবাক করেছে। তিনি সত্যি সত্যি হতবাক হয়ে গেছেন। কাপুরুষদের কান্ড দেখে তিনি নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

সেই প্রথমবারের অভিযানেও সুলতান প্রতিশোধ নিতে চাননি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বাসনা তাঁর ছিলো না। পরপর সব অভিযানেই তিনি নিজের সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার বিনিময়ে পেয়েছেন শুধু বিদ্রূপ আর বিষোদগার। লুন্ঠনকারী হিসেবে তারা তাঁকে আপ্যায়িত করেছে, বার বার বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছে।

অবশ্য তিনি হাল ছাড়েননি। আবার এসেছেন। আবার অভিযান চালিয়েছেন। পেশোয়ারের যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত। ভীতিয়ার যুদ্ধ তাঁর শিরে পরিয়ে দিয়েছে জয়মাল্য। মহাসমরে সুলতান বিজয়ী হয়েছেন।

উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, কালিঞ্জ, দিল্লী, আজমীরের যুদ্ধ জয় করেছেন। জয়পালের ছেলে আনন্দপাল রাজন্যবর্গের একত্র করেছিলো। সুলতানের বিরুদ্ধে তারা একজোটে লড়েছে। কিন্তু পারেনি। পিছু হটে গেছে। কিংবা পালিয়ে বেঁচেছে। পালাবার সময় নিয়ে গেছে রাজ্যের রাশি রাশি অর্থ সম্পদ। ঐশ্বর্য সম্ভার।

সব জেনে শুনেও সুলতান সে কথা প্রকাশ করতে পারেন না। উল্টো যতো দোষ পড়ে তাঁর ঘাড়ে। তারা দোষ দেয় তাঁর সেনাবাহিনীকে। কি আশ্চর্য ব্যাপার !

সহসা সুলতানের চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো। সুলতান সচকিত হলেন। সেনাবাহিনী-প্রধান সখেদে অভিযোগ জানালো। কুর্ণিশ করে বললো—ওরা পিছন দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। সমুখভাগে আমরা বারবার রচনা করেছি ব্যূহ। ওরা জানে, পিছন দিক থেকে ওরা পালাতে পারবে। এটা ওদের পুরোনো অভ্যাস। আর আমাদের সেই সনাতন নীতি, আমরা ওদের পালাবার পথ করে দিই।

সুলতান সহাস্যে আলবেরুনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পরে সেনাপতির চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলেন—তাহলে কি করতে হবে? আমাদের কর্তব্য কি?

সাহস পেয়ে বুঝি সেনাপতি বলে ফেললো—এর পর আমরা পালাবার পথ বন্ধ করে দিই। দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তা না হলে আবার ওরা দল বাঁধবে। আবার ওরা আক্রমণ করবে। আবার আমাদের অভিযান চালাতে হবে। সুতরাং এবার সমুচিত সাজা দিই।

সুলতান মাহমুদ তবু নিশ্চল। নিশ্চুপ। হুকুম দেবার আগে হয়তো বা গভীরভাবে ভেবে দেখছেন। এই সোমনাথ মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়েই বুঝি বা ভাবছেন মথুরা-বৃন্দাবনের কথা। সেখানে সেই একই দৃশ্য। একই রূপ। মন্দিরের সর্বস্ব গ্রাস করে তারা বহু আগেই চম্পট দিয়েছে। বহু আগে থেকেই তারা যেনো তৈরী থাকে। এই সোমনাথের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি, তারা যাবার সময় শুধু ফেলে রেখে যায় ইট, কাঠ আর পোড়ামাটি। এছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকার কথা নয়।

সে সব ভেবে-চিন্তেই সুলতান বললেন—না। তা হয় না। ওরা পালাক। পালিয়ে যাক। প্রয়োজন হলে আবার আমরা অভিযান করবো। আর একবার দেখবো ওদের দৌড় কতোদূর।

সতেরোবারের সেই শেষ অভিযানে সুলতান মাহমুদ স্বয়ং ছিলেন প্রধান সেনাপতি। সোমনাথ মন্দিরের পলাতক পুরোহিত হাজির হয়েছিলো তাঁর সামনে। মথুরা-বৃন্দাবনের সেবায়েতরা স্ব-ইচ্ছায় এসেছিলো সুলতানের কাছে। নিজে তাদের মন্দিরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারা দেখতে পেয়েছিলো সুলতান বিগ্রহ স্পর্শ করেননি, সুলতান কথা দিয়েছিলেন যা সাহায্যের প্রয়োজন তাই তিনি দেবেন। মন্দিরের দেবতা ফেলে তারা যেনো আর না পালায়। মন্দির রক্ষা করা তাদের ধর্ম, মন্দিরের মালিক তারাই।

সোমনাথের প্রধান পুরোহিত সুলতানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলো অঢেল উপঢৌকন। সুলতান তা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সবিনয়ে জানিয়ে দিলেন, ধন সম্পদের লালসা তাঁর নেই। তাঁর যতো লোভ গুণীজনের প্রতি। দেশ-বিদেশ থেকে তাদের তিনি লোপাট করেন। যেখানে যতো গুণীজন আছেন তাদের পেলে তিনি খুশী হন। তাতেই তাঁর তৃপ্তি। লুন্ঠন লুটতরাজ তাঁর নেশা বা পেশা নয়। এই মহান সত্য যেনো যুগে যুগে স্বীকৃত হয়। তারা যেনো তা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে। সাক্ষী থাকলো যার শুধু একমাত্র আল্লাহ-আল-গণি। আসমান জমিনের যিনি মালিক। সারা বিশ্বের সব মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা। স্বয়ং সুলতান তাঁরই প্রতিনিধি। তাঁরই খাদেম। মানুষের সেবার জন্যে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। সেখানে জাত বেজাতের প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেখানে এক ধর্মের পাশে থাকবে আর এক ধর্ম। এক মানুষের পাশে থাকবে আর এক মানুষ। মন্দিরের পাশে থাকবে মসজিদ। সবার সেখানে সমান অধিকার।

—•—

মহান-উদার বাদশাহ্ আলমগীর

[বাদশাহ আলমগীর। জগত-জয়ী মহাপরাক্রান্ত বীর। মহান উদার মহামানব। জয় করেছেন তিনি বহু দেশ, বহু জনপদ। জয় করেছেন জনগণের হৃদয়। তাঁর শাসন আমলে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়েছে ব্যাপক। পূবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে মোগল রাজত্বের প্রসার ঘটেছে বিস্তীর্ণ। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি হয়েছে ততোধিক। সর্বতোভাবে সুখে-শান্তিতে লোকে দিন গুজরান করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার পেয়েছে। দীনহীনজন থেকে সুধী-সুজন সমাদর পেয়েছে সমভাবে। রাজদরবারে রাজসভায় সবার ছিলো অবাধ গতি। যার যা ফরিয়াদ বাদশাহকে অসংকোচে জানাতে পারতো। বিশেষ করে বিচারের ক্ষেত্রে জাত-বেজাতের বালাই ছিলো না। সবাই সেখানে ন্যায় বিচার পেয়ে ধন্য হয়েছে। অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করেননি আলমগীর। রণক্ষেত্রে কিংবা রাজাসনে সবসময় তিনি সুবিচার করতেন। মানবতার আদর্শকে স্থান দিতেন সবার ঊর্ধে। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন মানুষ মানেই আল্লাহ্র বান্দা—ইনসান। আল্লাহ্র বিধান মতেই সে হক ইনসাফের দাবীদার।

বাদশাহ আলমগীরের এ-হেন উদার নীতিকে অনেকে অবশ্যই অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। অনেকে তাঁকে একরোখা

মুসলমান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। অনেকের অনুমান বাদশাহ্‌র ছিলো ইসলামের প্রতি অন্ধ গোঁড়ামী। বাদশাহ ছিলেন জাত গোঁড়া।

অথচ বাদশাহ আলমগীরের বিভিন্ন অভিধানে আর রাজকার্য পরিচালনায় তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাদশাহ আলমগীর তাঁর প্রতিটি কাজে মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তিনি সত্য-দিশারী সিপাহসালার বলে নিজেকে নিরংকুশ প্রমাণ করতে পেরেছেন।

বলাবাহুল্য, বিধর্মীর প্রতি বাদশাহ বিরূপ ছিলেন না। বিধর্মের প্রতি কখনো তাঁর বিমাতাসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং বহু ব্যাপারেই তাদের তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বহুক্ষেত্রেই তাদের বুকে জড়িয়ে আপন করে নিয়েছেন। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও তিনি এসেছেন দীনহীনের দরজায়। দুঃখীজনের দ্বারে দ্বারে। মাটির মানুষের কাছাকাছি হয়ে মানুষকে খাঁটি মানুষের মতোই ভালোবেসেছেন। এমন অসংখ্য নজীরের অভাব নেই। একদিন না একদিন সেই মহাসত্য স্বীকৃত হবে। আগামীদিনের ইতিহাস তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে।

এখানে শুধু বাদশাহ আলমগীরের মহানুভবতার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। মহান উদার বাদশাহ আলমগীরের উদারতার আলেখ্য আরো বহুধা বিস্তৃত—বিশদ। সে কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।]

দিল্লীর দরবার থেকে দাক্ষিণাত্য।

বহু দূরের পথ। বহু যোজন ব্যবধান।

সেখানে সসৈন্যে পেঁছিতে বেশ কিছুদিন লাগবে। হয়তো বা মাস কাবার হতে পারে।

তবু যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে। যতো জলদী পেঁছানো যায় ততোই ভালো।

দুঃসংবাদ এসেছে দাক্ষিণাত্য থেকে। মারাঠী দস্যুরা আবার উৎপাত শুরু করেছে। পর্বত-মুষিক শিবাজী আবার প্রকাশ্যে বের হয়েছে। গোটা তল্লাট জুড়ে চলছে তার লুটপাট আর লুন্ঠন।

কাপুরুষ শিবাজীর স্বভাব এতোটুকুও বদলায়নি। মওকা মতো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মোগল সাম্রাজ্যের দয়ার দানকে সে দুর্বলতা বলে মনে করছে।

মাত্র কয়েকদিন আগেই বাদশাহ তাকে ক্ষমা করেছিলেন। শিবাজী করুণা কামনা করেছিলো, সম্রাট তাকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। শিবাজী কথা দিয়েছিলো, আর কখনো না-ফরমানী করবে না। শিবাজীর শর্ত ছিলো মোগলের বশ্যতা সে স্বীকার করবে। শিবাজী সেই মর্মে দাস-খত লিখে দিয়েছে।

কিন্তু মারাঠী দস্যুর জবানের ঠিক নাই। জবান দেয়া মানে জাত দেয়া, তা সে জানে না। কিংবা জেনে-শুনেই যখন-তখন ভন্ডামী করে। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দাক্ষিণাত্য অঞ্চল। অসংখ্য অভিযোগ এসেছে তার সম্পর্কে। সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শিবাজী খুন করেছে কয়েকজনকে। কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি শিবাজীর কসাইখানায় জবেহ হয়েছে।

বাদশাহ আলমগীর খবর পেয়ে বলেছেন, বেঈমান! এতো বড়ো স্পর্ধা! এতোটা শয়তানী। মোগল সম্রাট তা বরদাশত করবে না।

সংগে সংগে বাদশাহ্‌র হুকুম হলো—সাজো সাজো সেনা-বাহিনী। সাজাও রণসাজ। বাজাও দামামা নাকাড়া। মারাঠা দস্যুকে সমুচিত সাজা দেবেন। এবার করুণা নয়। নেমকহারামের গর্দান চাই।

মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট বাহিনী সমর-সজ্জায় প্রস্তুত। পুরোভাগে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বলে রেকাবে এক পা দিয়েছেন। আর এক পা তখনো মাটিতে রাখা।

এমন সময় সেখানে দাঁড়ালো এক দীন-হীনজন। জরাজীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। গায়ে পায়ে ধুলি ধুসরিত। বাদশাহকে কুর্ণিশ করতে যেয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছে।

হুকুমদার হায়দরী হাঁক ছাড়ে, হঠ যাও। হুঁশিয়ার! বাদশাহ নামদার রওনা হবেন। যে যেখানে আছে-সরে দাঁড়াও।

ভীষণ ভয় পেয়েছে আগন্তুক। পালাতে পারলেই যেনো বাঁচে। পালাবার পথ খুঁজছে।

বাদশাহ আলমগীর তাকে দেখে ঘোড়া থেকে পা নামালেন। আগন্তুককে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন তার কি প্রয়োজন। কি জন্যে এসেছে, তার কি প্রয়োজন।

আগন্তুকের আড়ষ্টতা তখনো কাটেনি। এতোক্ষণ ভয়ে প্রায় কাঠ হয়ে যাবার মতোন অবস্থা। বাদশাহ্‌র কথা শুনে ধড়ে প্রাণ এলো বুঝি।

বাদশাহ আবার অভয় দিলেন। যা বলার সে অসংকোচে বলতে পারে। কুণ্ঠার কোন কারণ নেই।

আগন্তুক জানতো, বাদশাহ আলমগীর ন্যায়ের পূজারী। সত্যের কান্ডারী। বাদশাহ্ আলমগীর কখনো কোনোদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। সত্যের খাতিরে তিনি জান কোরবান করতে পারেন।

তবু সংশয় হয়, সে বিধর্মী। ব্রাহ্মণ। বাদশাহ আলমগীর গোঁড়া মুসলমান।

আর যার বিরুদ্ধে তার ফরিয়াদ সেও মুসলমান। একই কওমের লোক। বিশেষ করে সে ব্যক্তি প্রতাপশালী রাজ-কর্মচারী। বাদশাহ্র পেয়ারের লোক বলেই তাকে জানে।

বাদশাহ্ এবার ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখোমুখি হয়ে বললেন—যা বলার নির্ভয়ে বলো। আল্লাহ্র কসম আলমগীর সুবিচার করবে।

ব্রাহ্মণ আভূমি নত হয়ে জানালো তার নালিশ। তার ফরিয়াদ। সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে সে এসেছে। বহু দূর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। হাজার কষ্ট হোক তবু তাকে আসতে হলো।

বলতে বলতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। আর বুঝি বলার ক্ষমতা নেই। আর কিছু বলতে সে পারবে না।

বাদশাহ ওর হাতে হাত রাখলেন। তারপর হাত ধরেই বললেন—ভয় কি বলো। যিনি সব বাদশাহ্র বড়ো বাদশাহ তিনি তো দেখতে পাচ্ছেন। যিনি সব বিচারকের বড়ো বিচারক, তিনি তো ন্যায় বিচারই করবেন। আমি তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। আমার কাছে লজ্জা শরম কিসের?

এবার পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ জানালো তার দুঃখের কথা। দাক্ষিণাত্যের রাজকর্মচারী তার একমাত্র

কন্যাকে অপহরণ করেছে। হয়তো বা সত্যিকারের প্রমাণ সে দিতে পারবে না। কারণ রাজকর্মচারীর বিপুল প্রতাপ। সবার মুখ তিনি বন্ধ করে রেখেছেন।

শেষে ব্রাহ্মণ আবার কুর্ণিশ করে জানালো—তার সাক্ষী শুধু মালিক মেহেরবান। রাজার রাজা রাজাধিরাজ।

বাদশাহ আলমগীর আর বিলম্ব করলেন না। ব্রাহ্মণকে সংগে নিয়ে চললেন। সদলবলে সিপাই-শান্ত্রী, লোক-লস্কর ছুটে চললো।

দাক্ষিণাত্যে পেঁাছে বাদশাহ হুকুম করলেন আসামীকে এক্ষুনি পাকড়াও করে আনতে। কারো কোনো সুপারিশ তিনি শুনতে রাজী নন। বিচার না করা পর্যন্ত তিনি পানি স্পর্শ করবেন না। বাদশাহ্‌র প্রতিনিধির বিচার বাদশাহ নিজে করবেন।

আশপাশের লোকজন তখন ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে। তাদের ভয়, মোগল বাহিনী এসে কি কাণ্ডই না করে। এবার হয়তো কারো জান-মাল রক্ষা পাবে না। দুর্ধর্ষ মোগল বাহিনী সব ছারখার করে দেবে।

কিন্তু পরে তারা শুনলো, বাদশাহ আলমগীর স্বয়ং এসে উঠেছেন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। সেখানেই তাঁর বিচারালয় বসেছে। বাদশাহ আলমগীর নিজে বিচার করছেন। তাঁর সৈন্য-সামন্তরা ধরে এনেছে রাজকর্মচারী শরাফ খানকে। সেনাবাহিনী উদ্ধার করতে পেরেছে ব্রাহ্মণ কন্যা রাজিনীকে। কুমারী রাজিনী এখন রাহুমুক্ত।

সোল্লাসে জনগণ তখন জয়ধ্বনি দিচ্ছে—বাদশাহ আলমগীর জিন্দাবাদ। বাদশাহ নামদার জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ।

রাজকর্মচারী শরাফ খানকে বাদশাহ নিজে বেত্রাঘাত করছেন। তারা চোখের সামনে দেখছে। তারা স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছে সব। বাদশাহ বলছেন—তুমি মুসলমান নও, মোনাফেক। তোমার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। দোররা মেরে তোমাকে পরে কতল করা হবে। এই আমার হুকুম।

পরক্ষণেই বাদশাহ আলমগীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলেন—বলো বহিন, তুমি কি বিচার চাও। ওই পাষণ্ডটার হয়ে তোমার কাছে আমি মাফ চাই। আজ থেকে তুমি আমার বোন। তোমার যা অভিযোগ অসংকোচে বলতে পারো। আমি তোমার মান রাখবো বোন।

রাজিনী আর স্থির থাকতে পারলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে লুটিয়ে পড়েছে বাদশার পায়ে। বাদশাহ নামদার স্বয়ং এসে তাকে মুক্ত করেছে। এ যে কল্পনার অতীত! মুক্তির মহানন্দ ছাড়া সে তো আর কিছুই চায়নি।

বাদশাহ আলমগীর তার মাথায় সস্নেহে হাত রেখে বললেন—যাও বোন, তুমি নির্ভয়ে থাক। তোমার কোন ভয় নেই। এই নাও আমার পান্জা নিশান। যখন প্রয়োজন হবে আসবে। কেউ তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এই এলাকায় আমি তোমাকে বরগাদারী দিয়ে গেলাম। ভাইয়ের এই সামান্য দানটুকু মাথায় পেতে নাও।

বিদায় বেলায় রাজিনী দাবী জানালো—বোনের বাড়ীতে এই বেলাটা থাকতে হবে। খালি মুখে ফিরিয়ে দেবো না। পরম প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণ মিনতি করলো—বাদশাহ নামদার দুদন্ড অপেক্ষা করুন। আপনার আহারের আয়োজন করছি। সে দৃশ্য দেখে তখন চারপাশ থেকে আনন্দের সোরগোল

উঠেছে। জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।]

* * * *

আর একবার বিজাপুর অভিযানে চলেছেন আলমগীর। সারি সারি সৈন্য-সামন্ত দাঁড়িয়ে আছে। পুরোভাগে বাদশাহ। সে যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সিপাহসালার। তাঁর হুকুম হলেই সেনাবাহিনী এগিয়ে যাবে। এক পায়ে সব খাড়া।

বিজাপুরে আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ওদিকে মারাঠা দস্যু শিবাজী আবার সন্ধির শর্ত ভংগ করেছে। জাঠ শিখরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জয়সিংহ আর যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার খবর এসেছে। গোপনে গোপনে তারা বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

বাদশাহ নিজেই সেজন্যে যাচ্ছেন। সরেজমিনে সব তদন্ত করবেন। স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। বিজাপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর যাবেন আরো দূর দাক্ষিণাত্যে। তাতে যতোদিন যায় যাক্। যতোদিন লাগে লাগুক। এই শেষবারের মতো মারাঠা দস্যু শিবাজীর বিষ-দাঁত ভেংগে দেবেন। এবার আর তার ক্ষমা নেই। এবার আর কোন অজুহাতে তাকে ক্ষমা করবে না।

বারবার শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে মাফ করে দিয়েছেন। শিবাজী বার বার শপথ করেছে। আবার শপথ ভেংগেছে। সেই সুচতুর ধুরন্ধর দস্যু চূড়ামণির জবানের ঠিক নেই, তা বাদশাহ জানেন। সেনাপতিরা সে সম্পর্কে বারবার বাদশাহকে বলেছেন। তবু বাদশাহ বলেছেন, তিনি মুসলমান। তিনি জানেন, যার জবানের ঠিক নেই তার জাত নেই।

এই শেষবার তিনি তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন। শিবাজীকে চরমভাবে শায়েস্তা করবেন। কোনোক্রমেই তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। সেনাপতিদের সংগে তিনি সেই রকম সলা-পরামর্শও করেছেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ওয়াদা দিয়েছেন। এই শেষবার। শিবাজীর এই শেষ সুযোগ।

আর জয়সিংহ—যশোবন্ত সিংহকে তিনি হয়তো বা ক্ষমা করতে পারেন। তারা যদি সত্যিকারের অনুতপ্ত হয় ক্ষমা করে দেবেন। বাদশাহ ভেবে দেখেছেন ভালোভাবে। ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

কিন্তু বেঈমান শিবাজী তা বিশ্বাস করে না। জয়সিংহ—যশোবন্ত সিংহরা তা জেনেও জানে না। মওকা পেলেই তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়ার জঘন্য চক্রান্তে তারা লিপ্ত।

বাদশাহ সেই কারণে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে চলেছেন। অভিযানের আগে সেনাবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন। প্রতিটি অভিযানের সময়ই তিনি সেনাবাহিনীকে সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেন। আল্লাহ্‌র কসম থাকে তারা যেনো কোনো অন্যায় কাজ না করে। যত্রতত্র অত্যাচার থেকে তারা যেনো বিরত থাকে। বিশেষ করে শিশু আর নারীর কোনো ক্ষতি যেনো না হয়। লোকে যা বলুক বা ভাবুক বাদশাহ্‌র বিধান হলো তাই। সেনাবাহিনী সব সময়ই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

বিজাপুর অভিযানকালেও বাদশাহ সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা বলছেন। সেনাবাহিনী সাথে সাথে সায় দিচ্ছে। বাদশাহ বিসমিল্লাহ্‌ বলে রওনা হতে যাচ্ছেন।

নকীবের মুখে শেষ মুহূর্তে বাদশাহ জানতে চাইলেন কোন খবরাখবর আছে কি না। কারো কোনো প্রয়োজন। কিংবা কারো কোনো ফরিয়াদ।

বাদশাহ আলমগীরের বরাবরের অভ্যাস যাবার বেলায় সব জেনে যান। তাঁর হুকুম তামিল করে নকীব। যে কোন ব্যাপার তাকে বিদায় মুহূর্তে জানায়।

বাদশাহ শুনলেন বারানসী থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে। নকীব তাকে সংগে নিয়ে এসেছে। বাদশাহ নামদারকে সে কিছু বলতে চায়।

বাদশাহ বললেন—যা বলার নির্ভয়ে বলো। কোনো ভয়ের কারণ নেই।

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনে বাদশাহ বেশ বুঝতে পারলেন বেচারীরা বিব্রত। বড্ডো বিপাকে পড়েছে। তা না হলে অতোদূর পথ পাড়ি দিয়ে আসতো না।

বিজাপুর বিজয় আর হলো না। দাক্ষিণাত্য অভিযানও স্থগিত থাকলো। বাদশাহ মোড় ঘুরালেন বারানসীর দিকে। সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন বারানসী অভিযানের। সংগে নিয়ে চললেন বাদী ব্রাহ্মণকে। তাকে আশ্বাস দিলেন সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকতে। সব ব্যবস্থা তিনি করবেন।

বারানসীর দ্বারপ্রান্তে পা দিয়ে বাদশাহ তলব করলেন সেখানকার শাসনকর্তাকে। মীর্জা হাসান হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো।

বাদশাহ ফরমান দিলেন বারানসীর মন্দিরগুলো মেরামত করার। কোনো মন্দিরের কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হলে তা যেনো সংগে সংগে ঠিক করে দেয়া হয়। বাদশাহ স্বচক্ষে সব দেখবেন। যতোদিন পর্যন্ত মন্দির মেরামত না হয়

বাদশাহ ততোদিন সেখানেই অবস্থান করবেন। বারাণসীর প্রবেশ-পথ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না।

মীর্জা আবুল হাসান করজোড়ে জানালো, কোনো মন্দিরেরই কোনো ক্ষতি হয়নি। সবগুলো অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করছে। কেবল পূজার পূর্বে সেগুলোর নামমাত্র সংস্কারের দরকার। যথারীতি ঠিক সময়েই সে ব্যবস্থা করা হয়। সেই মোতাবেক কাজ করবেন।

বাদশাহ তার কোনো কথাই শুনলেন না। বললেন: এক সপ্তাহ সময় দেয়া গেলো। এর মধ্যে যদি সব ঠিকঠাক না হয় তাহলে গর্দান থাকবে না। কতল করার হুকুম দেবো।

মীর্জা হাসান হতভম্ব। তার কোনো কথাই বাদশাহ মানতে রাজী নন। সে বিব্রতবোধ করছে।

বেচারী ব্রাহ্মণও এতোবড়ো অভিযোগ করেনি। বাদশাহ অল্পেই অনেক বেশী অনুমান করে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়তো বা মন্দির ভেংগে-চুরে ফেলেছে। মন্দিরগুলোর সর্বনাশ হয়েছে।

অবশেষে ব্রাহ্মণ সবিনয়ে জানালো তার আরজ। বাদশাহকে বললো: মন্দিরের ক্ষতি সাধনের কথা সে বলেনি। মন্দিরের পুরোহিত বদলানোর ব্যাপারে সে আবেদন জানিয়েছে। মন্দিরসমূহের প্রধান পুরোহিত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার মতো কোনো গুণ তার নেই।

বাদশাহ শুনে মন্তব্য করলেন: সে দোষও আমার সুবাদারের। এই কর্তব্য তার অনেক আগেই সমাধা করা উচিত ছিলো। সে পারেনি। সুতরাং তার সমুচিত সাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাদশাহ্‌র আগমনবার্তা পেয়ে তখন দলে দলে লোক আসছে। বারাণসীর উপকন্ঠে লোকে লোকারণ্য। বাদশাহ তাদের মুখেও সেই একই কথা শুনলেন। হিন্দুরা দল বেঁধে বাদশাহ্‌র কাছে পুরোহিতের বিরুদ্ধে নালিশ করলো।

বাদশাহ তলব করলেন পুরোহিতকে। তার বক্তব্য শুনলেন। বুঝতে পারলেন সে নির্দোষ নয়।

বাদশাহ তাকে বললেনঃ বেশ তোমাকে সপ্তাহখানেক সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমার সৎগুণাবলীর সপ্রমাণ দাও। যদি তাতে ব্যর্থ হও তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।

সমবেত হিন্দু জনতা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলো—বাদশাহ আলমগীর জিন্দাবাদ। বাদশাহ নামদার জিন্দাবাদ।

সব শেষে বাদশাহ সেই ব্রাহ্মণকে আবার কাছে ডাকলেন। তাকে কানে কানে বললেন কি করতে হবে। ব্রাহ্মণ আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো।

সেই মুহূর্তেই পুরোহিত-প্রধান ভেবে-চিন্তে তার প্রার্থনা জানালো। বাদশাহ্‌র দরবারে তার আকুল আবেদন। আজ থেকেই সে পুরোহিতের পদ ত্যাগ করেছে। যথার্থই এ কাজের সে অনুপযুক্ত। বাদশাহ নামদার যেনো তার অন্য ব্যবস্থা করেন। রুজি-রোজগার তার যেনো বন্ধ না হয়। গ্রাসাচ্ছদনের অন্য কোনো অবলম্বন তার নেই।

বাদশাহ জানতে চাইলেন—সে কোন্ কাজ করতে পারবে নিজ মুখেই বলুক—বাদশাহ তাতেই রাজী।

পুরোহিত জানালো তার পক্ষে সুবিধা হয় রাজকর্মচারীর কাজ। এক সময় সে জয়সিংহের সেনাদলে ছিলো। পরে অনন্যোপায় হয়ে পালিয়ে এসেছে। কোনো কিছু না পেয়ে বাধ্য হয়ে পুরোহিতগিরি করছে। এ তার পেশা নয়।

পুরোহিত আরো বললো ঃ বাদশাহ আলমগীরের মহানুভবতার পরিচয় পেয়েই সে অকপটে সব স্বীকার করছে। বাদশাহ্‌র সম্পর্কে আগে যা সে শুনেছে সব মিথ্যা। সব ফাঁকি। সে নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাচ্ছে বাদশাহ কতো মহান! কতো উদার!

বাদশাহ আলমগীর তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিলেন নিজের তরবারি। বললেন ঃ এই নাও তোমার পুরস্কার। হুকুম জানালেন তাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে। এই অভিযানে সে হবে অন্যতম অগ্রনায়ক।

সে সংবাদ শুনে ব্রাহ্মণ দলবলসহ আবার আরজ জানালো ঃ হুজুর কি সর্বনাশ করছেন। ও লোকটা নেমকহারাম। বেঈমান। সব জেনে-শুনে আপনি ওকে এহেন পদমর্যাদা দেবেন না।

সেদিন সমবেত হিন্দু জনতার সামনে বাদশাহ আলমগীর বিদায়ী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি আজ আছি কাল নেই। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, এখানে মানুষ থাকবে। এখানে মন্দিরও থাকবে। হিন্দুরা আমার প্রজা। আমার কারণে তারা যদি বিপাকে পড়ে সে দোষ আমার। তারা যদি পথভ্রষ্ট হয় তার জন্যেও আমি দায়ী। বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের নীতি। আল্লাহ্‌র বিধান। তার বরখেলাফ আমি করবো না।

সংগে সংগে হিন্দু জনতাকে উপদেশ দিলেন ঃ তারা যেনো নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ না করে। নিজেরা যেনো অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়। বারাণসীর আদর্শ সারা বিশ্বের গর্ব হয়ে থাক।

দশদিক তখন বাদশাহ আলমগীরের জয়ধ্বনিতে মুখর। বাদশাহ্‌র মতো বাদশাহ বটে বাদশাহ আলমগীর।

সকল কালের স্মরণীয় মহাপুরুষ খান জাহান আলী খান

[মোগল বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি হয়ে এদেশে এসেছিলেন খান জাহান আলী খান। তিনি ছিলেন সুবে-বাংলার শাসনকর্তা। সুন্দরবন এলাকা আবাদ তাঁর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। সুন্দরবনের সমগ্র এলাকা তিনি আবাদ করেন। তখনকার সুন্দরবনকে বলা হতো তাঁর সাম্রাজ্য। আজকের তুলনায় তখন তার পরিধি ছিলো বিপুল বিশাল।

বর্তমান বাগেরহাটে খান জাহান আলী খানের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। সেখানেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। সেখান থেকেই রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্যে স্থানে স্থানে গড়ে তোলেন থানা আর চৌকী, প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন সরকারী দফতর। কোর্ট-কাছারী, মহাফেজখানা। আইন-আদালতের আওতায় গোটা দেশটাকে কয়েকটা পরগণায় বিভক্ত করেন। সাধারণ মানুষের ঘরে-ঘরে পেঁাছিয়ে দেন সুশাসনের সনদ। স্বাধীনতার স্বাদ।

খান জাহান আলী খান শুধু সুশাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সূফী-সাধক-আউলিয়া দরবেশ। বাগেরহাটে তাঁর অমর কীর্তি আজো বিরাজমান। ষাট-গম্বুজ মসজিদের

মতো ঐতিহাসিক অট্টালিকার তিনি স্থাপয়িতা। এই সুরম্য-সুশোভিত মসজিদের পাশেই তাঁর নিজ হাতে নির্মিত খানকা ও ঘোড়া-দীঘি ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন। তা ছাড়া আরো অনেক অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত উপাসনালয়ের তিনি স্রষ্টা, অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। সুফী-সাধক খান জাহান আলী খানের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তিনি ছিলেন আদর্শ সংস্কারক। আদর্শ শাসক। তাঁর মহোত্তম ধ্যান-ধারণার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সুশাসনের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। আধ্যাত্মিক বলে তিনি যেমন বনের পশুকে বশ করেছেন, তেমনি মানুষের মন জয় করেছেন স্বীয় সুশাসনের প্রভাবে। শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে—এই প্রচলিত প্রবাদের প্রমাণ তিনি হাতেনাতে দিয়েছেন।

তখনকার বর্ণ-হিন্দুদের বিশ্বাস ছিলো, মুসলমান শাসক মানেই শোষক। মুসলমানকে তারা আখ্যা দিয়েছে যবন-জল্লাদ। মুসলমানের হাতে পড়লেই জাত যাবে, এই ছিলো তাদের বদ্ধমূল ধারণা। খান জাহান আলী খানের প্রতিও সেরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে তারা দ্বিধা করেনি।

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেছে খান জাহান আলী খাঁটি মুসলমান। সাধারণ মানুষের বিচারে অসাধারণ মহামানব—মহাপুরুষ। মুসলমানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের তখন আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মুসলমান সুফী-শাসকের কাছে ধীরে ধীরে নত হয়ে এসেছে তাদের মাথা। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে খাঁটি মুসলমান মানেই খাঁটি মানুষ। খাঁটি ঈমানদার। সবার চোখে যারা অজাতশত্রু, রাজদন্ড তাদের হাতেই শোভা পায়।

বলাবাহুল্য, খান জাহান আলীর আগমন এদেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন হয়। অশান্তি-অরাজকতা দূরীভূত হয়। সমগ্র দেশ জুড়ে আসে সুখ-সমৃদ্ধির সওগাত।

শান্তির সওগাত নিয়ে আসেন সূফী-সাধক খান জাহান আলী। সে কাহিনী লোকের মুখে-মুখে সোচ্চার হয়ে ওঠে। মহাকালের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আলোচিত নিবন্ধে তার আংশিক রেখাপাত করা হয়েছে মাত্র।]

* *

খান জাহান আলী আসছেন।

সেই সূফী দরবেশের নাম শুনে সবাই তটস্থ। সবাই সন্ত্রস্ত। তিনি নাকি বাঘের পিঠে সওয়ার হন। বনের ভয়াল বাঘকে বশ করেন। জন্তু-জানোয়ারের সাথে ওঠেন বসেন। ভয়ংকর অজগর তাঁকে সালাম জানায়। পাখ-পাখালী সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করে। এমনি তাঁর শক্তি। এহেন শক্তিধর মহাপুরুষ!

তিনিই আসছেন এবার শাসনকর্তা হয়ে। সুন্দরবন এলাকা আবাদ করবেন। সুন্দরবনের আশপাশ সংস্কার করবেন। সবার উপরে তাঁর কাজ হলো বাংলার বিদ্রোহ দমন। বড়ো বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে এখানে-ওখানে সেখানে। সারা দেশটায় অনাসৃষ্টি চলছে। কথায় কথায় দেশবাসী বিদ্রোহ করছে। এবার তিনি শায়েস্তা করবেন, বিদ্রোহীদের চরম শাস্তি দেবেন। অংগীকার করে তিনি আসছেন। সিপাই-সান্ত্রী লোক-লস্কর সব আসছে তাঁর সংগে। তেগ-তলোয়ার হাতিয়ার আসছে অজস্র-অঢেল। দলে

দলে আসছে পাঠান সেনা। সদলবলে আসছেন খান জাহান আলী।

লোকে বলে তাঁর এক হাতে তসবী আর এক হাতে তলোয়ার। একদিকে তাঁর অলৌকিক শক্তি আর একদিকে অভাবনীয় বাহুবল। কোনটার কমতি নেই।

তারও আগে লোকের মুখে মুখে রটে গেছে খান জাহান আলী খান পাট্টা-পাঠান। চোগা-চাপকান পাগড়ী পরা মুসলমান। তিনি গোঁড়া হবেন তাতে সন্দেহ কি। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান। সময় থাকতেই সব সতর্ক হও। সেই দরবেশ-শাসক এসে পড়লে আর রক্ষাই নেই। একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বে।

এরপর লোকে সত্যি সত্যি শুনলো খান জাহান আলী খান এসে গেছেন। এসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সুন্দরবন এলাকা আবাদ করার সাথে সাথেই মসজিদ তৈরী করছেন। তবলীগ জামাতে তশরীফ আনছেন। ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। খাস মুসলমানী লেবাস পরে ফতোয়া দিচ্ছেন। তখন আর ভয়-ভাবনার অন্ত থাকলো না। বিধর্মীদের বুক দুরু দুরু করে উঠলো। তাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো, এবার জানে-মালে খতম হয়ে যাবে। এবার দেশ ছেড়ে পালাতে হবে কিংবা নাক-খত্ দিয়ে ইসলাম কবুল করা। জাত খুইয়ে মুসলমান না হলে মরণ।

গ্রামে-গঞ্জে, ঘরে-ঘরে গুঞ্জরণ উঠলো, অমুসলিম অঞ্চলে গোপনে গোপনে সভা-সমাবেশ হলো। ব্রাহ্মণ-বৈশ্য, শূদ্র-ক্ষত্রিয় সবাই একজোট। গোত্রে গোত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে তাদের কাজ করতে হবে। স্থির সিদ্ধান্ত

নিতে হবে তাদের কর্তব্য কি ? যদি দেশ ছাড়তে হয় তা-ও ভালো। তবু বে-জাতের হাতে মরবে না। মুসলমানের হাতে জাত খোয়াবে না। হোক না পীর-দরবেশ, হোক না কামেল-ফকীর। আসলে তো মুসলমান, তাতে আবার জাত পাঠান। জাতে জাতে ওরা সমানে সমান।

অবশ্য তার আগে একবার পরীক্ষা করা দরকার। সমাজ-পতিরা সম্মত হলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা হয় করা যাবে। তাঁদের মধ্যে একজন হাজির হোক দরবারে। দেখে আসুক কি কান্ড ঘটছে। জেনে আসুক সব সংবাদ। তারপর ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে।

খান জাহান আলী সেদিন সপারিষদ বসে আছেন। রাজ্যের খবরাখবর নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। সমবেত লোকজনের অভাব-অভিযোগ শুনছেন। অনেককে আবার এনাম দিচ্ছেন, অনেককে বকশিশ দিয়ে বিদায় করছেন। অনেকেই নিয়ে যাচ্ছে খাদ্য-সামগ্রী আর পোশাক-পরিচ্ছদ, অসুখ-বিসুখের ওষুধ-পত্তর-পণ্য।

সদ্য আগত ব্যক্তিটি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে অবাক হচ্ছে। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি সুমধুর আচার-ব্যবহার। দুয়ে মিলে বুঝি পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। দেখে-শুনে তার স্পষ্ট প্রতীতি হলো, ইনি মানুষ নন, দেবতা, হয়তো বা দেবতার চেয়েও বড়ো।

তবু তার কাছে আসতে সাহস হয় না। সে যে নকল লেবাস পরে এসেছে। এই মজলিশে সে বেমানান। এই আসল মানুষটির কাছে সে নেহাৎ নকল-নবীশ। তার সবটুকুই মেকী।

ভয়ে-ভাবনায় তখন তার আক্কেল গুড়ুম, যদি ধরা পড়ে। যদি ওই সাধক-দরবেশ তার নকল রূপ ধরে ফেলেন। তা হলে কি হবে? কি হতে পারে? তবু কেমন যেনো ভরসা হয়। এখানে নিশ্চয় ভয় পাবার কারণ নেই। এখানে সবাই নির্ভয়। সবাই নিশ্চিন্ত।

দেখতে দেখতে লোকজন চলে গেলো। কতোক্ষণ সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিলো না। কতো রাত হয়ে গেছে!

হঠাৎ তার হুঁশ হলো। তার কাছাকাছি এসে পড়েছেন সেই সূফী-দরবেশ। যার নাম শুনে মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা। একেবারে তিনি তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরম সোহাগে তাঁর মাথায় হাত রেখে হাসিমুখে কথা বলছেন।

কিন্তু তার তো বলার মতো কিছু নেই। বলতে যেয়েও কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। সর্বাংগ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সর্বাংগে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। হয়তো বা এক্ষুণি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আর তাল সামলাতে পারছে না।

সাধক-দরবেশ তখনি তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে তাকে তুলে আনলেন দরবার ঘরে। আপন হাতে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সারিয়ে তুললেন।

একদিন গেলো। দু'দিন গেলো। এক সময় সে নিজেকে প্রকাশ করে ফেললো। প্রকাশ করলো তার সত্য পরিচয়। তার গোপন কথা।

এ-দিকে সমাজপতিদের সংশয় বাড়ছে। তারা সন্দেহ পোষণ করছে হয়তো তাকে কতল করা হয়েছে।

আর একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পাঠান হলো আর একজন চালাক-চৌকোস ব্যক্তিকে। দরবারে আবির্ভাব হলো আর একজন নবাগত।

দিনের পর দিন কেটে গেলো। তারও সাড়া পাওয়া গেলো না। সঠিক সন্ধান নিতে এগিয়ে এলো আরো একজন। তারপরে আরো একজন। এমনি করে একজনের পর একজন আসে। একজনের পর আর একজনের আগমন হয়।

কিন্তু যে যায় সে আর ফিরে আসে না। কারো কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। গোপনীয় খবরও জানতে পারা যায় না। জানবার সব পথ বন্ধ।

ততোদিনে সমাজপতিদেরও সাহস বেড়েছে। তারা ধীরে ধীরে নিরাপত্তা অনুভব করছেন। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে দিন কাটাচ্ছেন। কোন অশান্তি-ঝামেলা নেই। নিশ্চিত নিরুপদ্রব জীবন যাপন।

তবু তারা সংবাদ সংগ্রহ করতে কসুর করেন নি। সমাজের সেরা সেরা লোকদের পাঠাচ্ছেন। ভাবেন এইবার বুঝি এই লোক ফিরে আসবে। সঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিনের উৎকন্ঠার অবসান হবে।

কিন্তু না। কিছু হলো না। কারো ফেরার নাম-গন্ধ নেই। সব লা-পাত্তা হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ক'জন মিলে এগিয়ে এলেন। সমাজপতিরা দল বেঁধে চললেন দরবারে। যতোটা সম্ভব নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখবেন। সংগোপনে সবকিছু পরখ করবেন। এই শেষবার, যা হয় হবে।

গন্তব্যস্থলে পেঁছেই তারা চোখে জ্যান্ত ভূত দেখছেন! ওরা কেউ মরেনি। সব বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তে

আছে। পোশাকে আশাকে তারা খাঁটি মুসলমান ব'নে গেছে।

ওরা ভাবলেন সত্যি সব বাহাদুর বটে। কাজ হাসিল না করে কেউ ফিরবে না। গোপনে-গোপনে ঠিক আঁটঘাট বেঁধে কাজ করছে। এবার কেল্লা ফতে।

দিনের শেষে দেখা গেলো যারা গেলেন তারা আর ফিরলেন না। এক সময় তারাও সদলবলে বসে পড়েছেন দরবারে। খান জাহান আলীর মুখের ভাষা আর মধুর ব্যক্তিত্ব তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। সুফী-সাধকের সংগ ছাড়তে মন মানে না। এ যে খাঁটি পরশ মানিক, যার পরশে মনের সব মালিন্য মুছে যায়!

তারপর সেখানে বসেই তারা সংবাদ পাঠালেন গ্রামে গ্রামে। সংবাদ পেঁাছে গেলো ঘরে-ঘরে। তারা নির্ভয়ে জানালেন—খান জাহান আলী খান তাদের সংগে আসছেন। গ্রামে-গ্রামে যাবেন সুফী-সাধক। তিনি শুধু শাসক নন, প্রজাপালক। তিনি মানুষ নন, মহামানব। মহাদেবতা। দেবতার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। তিনি হিন্দু নন।। মুসলমান নন। সব মানুষের আপনজন। সবার পরম প্রিয়। পরমাত্মীয়। আর কোন ভয়-ভাবনা নেই। সম্পূর্ণ নির্ভয়।

সেই পরম ও চরম সত্যটাই সুফী সাধক তুলে ধরেছিলেন প্রথম দিনের নবাগতকে। খান জাহান আলী খান বলেছিলেনঃ মুসলমান বিশ্বাস করে সব মানুষ সমান। কেউ বড় কেউ ছোট নয়। সবাই আশরাফুল মাখলুকাত। আর ইসলাম মানে আদর্শের পতাকা। মানবতার সনদ। যেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য নাই।

নবাগত বলেছিলো, আপনাকে কিন্তু যাচাই করতে এসেছিলাম তা জানেন। সে পরীক্ষায় আমি পাস করেছি। কূপমন্ডুক হয়ে সাগর দর্শন আমার সার্থক হয়েছে।

খান জাহান আলী খান সহাস্যে বলেছেন ঃ তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু। আমরা এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এক আল্লাহ্‌র বান্দা। তোমার-আমার মাঝে ভেদাভেদ থাকবে কেন! আমরা সবাই এক জাতি। আমরা মানুষ— আমরা ইনসান।

সমাপ্ত